বাংলাদেশে ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার: দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে সবচে অমীমাংসিত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিষয়

আবুল বারকাত*

সারকথা

আর্থ-সামাজিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের বঞ্চনা বৃদ্ধি উন্নয়ন নয়। এ প্রক্রিয়ায় বঞ্চিতদের অন্তর্ভূক্তিটাই আসলে উন্নয়ন। উন্নয়ন বলতে আসলে মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ বুঝায়। যেখানে নিশ্চিত হতে হবে মানুষের পাঁচ ধরণের স্বাধীনতা: অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক সুবিধাদি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্বচ্ছতার গ্যারান্টি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা। জমি-জলা সমৃদ্ধ এ দেশে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে দরিদ্র রেখে এ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তা সম্ভব নয় মানব-দারিদ্র্যের উৎসমূখ বন্ধ না করে। একদিকে অর্থনীতি ও রাজনীতি ক্রমান্বয়ে অধিকহারে দুর্বৃত্তায়িত হতে থাকবে আর অন্যদিকে দরিদ্র-দারিদ্র্য সৃষ্টির উ ৎস বিলুপ্ত হবে– তাও হবার নয়। আবার এর অর্থ এও নয় যে হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাই শ্রেয়। দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই-সংগ্রামটা– ধরণ ও পদ্ধতি যাই হোক না কেন– একটা মৌলিক কাজ। এ দৃষ্টিতে ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের (land reform, agrarian reform, aquarian reform) কাজটি মৌলিকতম। এ লড়াইয়ে– বর্তমান কাঠামোতেই– কয়েকটি ক্ষেত্রে অর্জন সম্ভব; অনেক দূর। আর ছোট ছোট অর্জন ধরে রাখতে পারলে সমগ্র কাঠামোটির কাঙ্খিত পরিবর্তনও ত্বরান্বিত হবে। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারে যে সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় অর্জন সম্ভব সেগুলি হ'ল: খাস জমি-জলায় দরিদ্র মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং তাঁরা যেন তা ধরে রাখতে পারে (বাজার অন্ধত্বের যুগে) সে লক্ষ্যের কর্মকান্ড; শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন (যা লড়াই-সংগ্রামের ফলে বাতিল হয়েছে)-এ ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ; ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের জমি-জলা-বনভূমির উপর অধিকার ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই; জমি সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার নিশ্চিত করার লড়াই; জল-জলায় মৎস্যজীবি নারী-পুরুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই; চিংড়িঘেরসহ লোনা-পানি সম্পদে উপকূলের দরিদ্র-প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম; ভূমি মামলা-সংশিষ্ট ব্যাপক অপচয় রোধ; এবং ভূমি প্রশাসন-ব্যবস্থাপনা-আইনী প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ কার্যকরী অবস্থান গ্রহন। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যেহেতু শেষ বিচারে গভীর রাজনৈতিক সেহেতু সমগ্রক সমাধানে চাই উষ্ণ হৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব এবং সমগ্র প্রক্রিয়ায় জনগণের সুদৃঢ় অংশগ্রহণ।

* অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (email: hdrc@bangla.net)

ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার: সমাজ-অর্থনীতি কাঠামোর বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়

কৃষি সংস্কার (agrarian reform)-এর প্রকৃত অর্থ হ'ল কৃষিতে এমন ধরণের কাঠামোগত রূপান্তর যার ফলে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ত্বরান্বয়নে কৃষির উৎপাদন সম্পর্ক (যার নির্দ্ধারক জমি ও জলার মালিকানাসহ অভিগম্যতা কাঠামোর পরিবর্তন) পরিবর্তিত হয়। ফলে কৃষিতে শ্রেণী-সম্পর্ক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। আর ***ভূমি সংস্কার*** (land reform) হ'ল ঐ কৃষি সংস্কারের অন্যতম অনুষঙ্গ। ভূমি সংস্কারকে বলা যেতে পারে ক্ষুদ্রার্থের কৃষি সংস্কার। ভূমি সংস্কার বলতে সাধারণত আমরা বুঝে থাকি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরকারী মালিকানার খাস জলা-জমির বন্টন-বন্দোবস্ত; বর্গাদারসহ অন্যের মালিকানাধীন জমি-জলাতে যারা শ্রম দিচ্ছেন তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ইত্যাদি।

কৃষি-জলা সংস্কারের অনুষঙ্গ হ'ল উল্লেখিত ভূমি সংস্কারসহ ভূমি মালিকানার পরিবর্তন, অনুপস্থিত জমি-জলা মালিকানা ব্যবস্থা সুরাহা, সিলিং উদ্বৃত্ত জমি-জলা বন্টন, সংশ্লিষ্ট আইন-কানুনের পরিবর্তন, বর্গা/ভাগ-চাষসহ কৃষিতে বিভিন্ন ধরণের ভোগদখল স্বত্বের (টেন্যুরিয়েল সিস্টেম) পরিবর্তন, প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তর, ভূমি-জলাকেন্দ্রিক বিবাদ-মামলাজনিত অপচয় হ্রাস, রেকর্ড, রেজিস্ট্রেশন, প্রশাসন, বাজার, মজুরী, পরিবেশ-বান্ধব কৃষি (টেকসই কৃষি), কৃষিতে নারী-শ্রমের স্বীকৃতি, বিশ্বায়নের আওতায় কৃষিতে সংশ্লিষ্ট নীতি-কৌশল, প্রযুক্তি এবং ইনপুট খাতসমূহে পরিবর্তন। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার– রাজনৈতিক বিষয়। এ সংস্কারে আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রসঙ্গটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে। কারণ বিষয়টি আসলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিরন্তরভাবে বঞ্চিতদের অন্তর্ভূক্তি (inclusion of the excluded) কেন্দ্রিক।

গত বত্রিশ বছরের উন্নয়নের নিরিখে বাংলাদেশ দৃশ্যত অর্থনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের (economic criminalization) ফাঁদে পড়েছে। অর্থনৈতিক এ দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতি ও সমাজের সকল স্তরে দুর্বৃত্তায়ন ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। বিদ্যমান কৃষি কাঠামো সামগ্রিক এ দুর্বৃত্তায়নের বাইরের কোন বিষয় নয়। এ দুর্বৃত্তায়নের ফলে আমরা এক প্রকার বঞ্চিতদের নিরন্তরভাবে বহির্ভূক্তকরণ (exclusion of the excluded) প্রক্রিয়া লাভ করেছি। এটি এমন এক পরিবেশ যা বঞ্চিতদের আরও বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এ এমন পরিস্থিতি যা মানুষের পরিপূর্ণ জীবন প্রাপ্তির (বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করার নিশ্চয়তা) সুযোগ সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়াগুলো নস্যাৎ করে দেয়। এখন এক লুণ্ঠন সংস্কৃতি আমাদের পেয়ে বসেছে। যা কিছু মানব উন্নয়নের বিরুদ্ধে যায়, যা কিছু দুর্বৃত্তায়নে সহায়ক, সার্বিক

তথ্য উৎস: এ প্রবন্ধে উত্থাপিত বিষয়াদি বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গবেষণা উৎস ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হ'ল A. Barkat, S Zaman, S Raihan (2001), *Political Economy of Khas Land in Bangladesh*; A. Barkat and PK Roy (2004), *Political Economy of Land Litigation in Bangladesh: A Case of Colossal National Wastage*; A. Barkat *et. al* (2000), *An Inquiry into Causes and Consequences of Deprivation of Hindu Minorities in Bangladesh through the Vested Property Act*; A. Barkat (2004), *Poverty and Access to Land in South Asia–Bangladesh Country Study*; A. Barkat (2003), *Right to Development and Human Development: Concepts and Status in Bangladesh*; A. Barkat (2004), *Commercial Shrimp Cultivation, Eroded Environment and Livelihood of the Poor*; Shapan Adnan (2004), *Migration, Land and Ethnic Conflict: Causes of Poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh*. প্রবন্ধটি কয়েক দফা টাইপ করে সহযোগিতার জন্য প্রাবন্ধিক মানব উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (এইচ ডি আর সি) জনাব মোজাম্মেল হক-এর কাছে দায়বদ্ধ।

পরিস্থিতি যেন সেগুলোর প্রতিই পক্ষপাত প্রদর্শন করছে। মানব উন্নয়নের জন্য অনুকূল সকল সূচক ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে, আর অন্যদিকে দুর্বৃত্তায়নের অনুকূল সূচকগুলো ক্রমান্বয়ে আরও শক্তিশালী হচ্ছে। এর ফলে মানুষের মুক্ত ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার সুযোগ সীমিত হচ্ছে। গত ৩২ বছরের উন্নয়নে আমরা আবার সেই বৈষম্যমূলক দ্বৈত-অর্থনীতিতে আরও জোড়ালোভাবে ফিরে গেছি: একটি অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে সবচেয়ে ক্ষমতাধর ও প্রভাবশালী মাত্র ১০ লাখ মানুষ (ক্ষমতায় যেই থাকুক না কেন, এরাই চালকের আসনে থাকে); অপর অর্থনীতির প্রতিনিধিত্ব করছে ক্ষমতাহীন সংখ্যাগরিষ্ঠ ১৩ কোটি ৯০ লাখ মানুষ। এরা বহিস্থ, বঞ্চিত ও নিঃস্ব (অথচ আমাদের সংবিধান বলছে "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হইবেন জনগণ"....?– অনুচ্ছেদ ৭.১)। আমাদের দেশের চলমান দারিদ্র্য, দরিদ্র মানুষের জমি-জলার মালিকানা বা অভিগম্যতা তথা ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর বাইরের বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। কাঠামোটিই এমন যা ভূমি-কৃষি-জলা উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদন করে (নিচের বক্স দেখুন)।

ভূমি ও জলা বঞ্চনার পাটিগণিত

বাংলাদেশে মোট ভূমির পরিমাণ ৩ কোটি ৭৪ লাখ একর যার মধ্যে ৬০% কৃষি জমি। এক কোটি ৬০ লাখ একর জমি (৪৩%) ব্যক্তি মালিকানাধীন; বছরে প্রায় ২৪ লাখ একর মামলাধীন এবং ভুমি-সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা এখন বছরে প্রায় ২৫ লাখ। প্রায় ১ কোটি একর জমি সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়। চিহ্নিত খাস জমি (কৃষি ও অকৃষিসহ) ও জলার পরিমাণ ৩৩ লাখ একর। সেই সাথে অর্পিত

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোর মধ্যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ভূমি-উত্থিত দারিদ্র্য-বঞ্চনা পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্র ও পরিণাম

ক্ষেত্র

- খাস জমি ও জলা
- অর্পিত জমি-সম্পত্তি (ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়)
- ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের জমি-সম্পত্তি
- জলা সম্পদে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অধিকারহীনতা
- চিংড়ি চাষজনিত প্রান্তিকতা
- জমি-সম্পত্তিতে নারীদের অধিকারহীনতা
- ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ-মামলা
- ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার ত্রুটি-দুর্নীতি
- দরিদ্র-বিরোধী আইন-কানুন ও আইনি প্রক্রিয়ায় মানুষের আস্থাহীনতা

পরিণাম/অভিঘাত

- দারিদ্র্য পুনরুৎপাদন: নি:স্বায়ন থেকে ভিক্ষুকায়ন
- ভূমি-জল-বন দস্যুতা বৃদ্ধি
- ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনতা
- ক্রমবর্দ্ধমান বৈষম্য
- ক্রমবর্ধমান বহি:স্থকরণ-বঞ্চনা (exclusion): গ্রাম থেকে শহরে গলাধাক্কা অভিবাসন
- শহরে অনানুষ্ঠানিক খাতের বিস্তৃতি-প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি: নগরায়ন নয় বস্তিয়ায়ন
- জল-সম্পদের উৎপাদনশীলতা হ্রাস
- নারীর ক্ষমতায়নে বাঁধা
- ভূমি কেন্দ্রিক দুর্নীতি বৃদ্ধি
- ভূমি কেন্দ্রিক মামলা-মোকদ্দমায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়
- সামাজিক পূঁজি সৃষ্টিতে বাঁধা
- কৃষির সম্ভাব্য উৎপাদনশীলতা হ্রাস
- মঙ্গা-ক্ষুধা বৃদ্ধি, দুর্ভিক্ষ

সম্পত্তি আইনে সরকারের জিম্মায় আছে ২১ লাখ একর; আর পরিত্যাক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১০ লাখ একর।

দরিদ্রদের মধ্যে খাস জমি-জলা বন্টন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের ভূমি অধিকার খর্ব করা, ভূমির প্রতি নারীদের অধিকার হরণ, জলাতে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অধিকারহরণ, ভূমি মামলায় জাতীয় ও পারিবারিক ব্যাপক অপচয়– এসবই এদেশে কৃষি সংস্কারের অন্যতম অমীমাংসিত বিষয়। গত চার দশকে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে তিনগুণ; ঘটেছে ভূমি মালিকানার পুঞ্জিভবন। আবির্ভূত হয়েছে এক ভুমিদস্যু-জলদস্যু-বনদস্যু গোষ্ঠী। আর এসব দস্যুরাই আবার দুর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক রাষ্ট্রিক কাঠামোতে প্রবল প্রতিপত্তিশীল।

এসবে নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে তথাকথিত নগরায়ন যা আসলে বস্তিয়ায়ন অথবা নগর-জীবনের গ্রামায়ন। এও ঘটেছে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য, ভূমিহীনতা ও কর্মহীনতার ফলে। এটা গ্রাম থেকে এক ধরণের গলাধাক্কা অভিবাসন। নগরের জনসংখ্যা বেড়েছে নগরবাসীর প্রজনন হার বৃদ্ধির ফলে নয় গ্রাম থেকে ব্যাপক দরিদ্র-বঞ্চিত নিঃস্ব মানুষের বাধ্য হয়ে শহরমুখী হবার ফলে। বেড়েছে শহরে জমির দাম– এমন বাড়া বেড়েছে যার কারণটি প্রথাসিদ্ধ অর্থশাস্ত্র বিশ্লেষণে অপারগ। ঢাকা শহরেই এখন এক কোটির বেশী মানুষ (যা দেশের মোট নগর জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ)। যে কারণেই ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে জমি-দস্যুতা এমনই প্রকট রূপ নিয়েছে যে ভূমি মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটিও বলছে ঢাকা শহর ও তার আশে পাশে ভূমি-দস্যুরা ১০,০০০ একর জমি বেদখল করে আছে (যা দেশের প্রচলিত আইন, "Water Preservation Act" বিরুদ্ধ)।

ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার সাথে নগরায়নের সম্পর্ক সম্পর্কে অবশ্যই এ কথা গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে যে দ্রুত শহরায়নের ফলে কৃষিতে অনুপস্থিত ভূস্বামীর (absentee landlord) মালিকানায় জমি-জলার পরিমাণ গত দু-তিন দশকে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সরাসরি ফল হ'ল ভাগচাষের আওতায় জমি-জলার পরিমাণ বৃদ্ধি, জমি-জলার প্রকৃত উৎপাদিকা হ্রাস, কৃষি দিন মজুরের অবস্থার অবনতি ইত্যাদি।

ভূমি মালিকানার পরিবর্তন এবং আর্থ-সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর বিবর্তন

১৯৬০ সালে এদেশে ভূমিহীন খানার সংখ্যা ছিল মোট খানার ১৯% যা ১৯৯৬ সালে মোট খানার ৫৬%-এ উন্নিত হয়েছে। অন্যদিকে ১৯৬০ সালে ১% ধনী ভূ-স্বামীর মালিকানায় ছিল মোট কৃষি জমির ৪.৭% যা ১৯৯৬ সালে হয়েছে ৮.২% (এসবই সরকারী হিসেব)। আমাদের দেশে এখন কার্যত ভুমিহীন পরিবারের সংখ্যা দেশের মোট পরিবারের অর্দ্ধেক অথচ মোট জমির মাত্র ৪.২% তাদের হাতে, আর অন্যদিকে ৬.২% পরিবার আছে (ভূমি মালিকানার নিরিখে ধনী) যাদের মালিকানায় আছে দেশের ৪০% জমি।

আর্থ-সামাজিক শ্রেণী কাঠামোর (class structure) বিবর্তন নিয়ে এ দেশে খুব একটা গবেষণা হয়নি। তবে আমার গবেষণায় দেখেছি একদিকে দরিদ্র ও নিম্নবিত্তের অধোগতি ঘটেছে, আর অন্যদিকে ভূমিসহ অন্যান্য বিত্ত-সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু ধনীর হাতে। এখন ১৪ কোটি মানুষের এদেশে ৯ কোটি ১০ লাখ (৬৫%) মানুষ দরিদ্র, ৪.৫ কোটি (৩২.১%) মধ্যবিত্ত, আর ৪০ লাখ (২.৯%) ধনী। আর মধ্যবিত্তদের মধ্যে ২ কোটি ৪০ লাখ (মোট মধ্যবিত্তের ৫৩.৩%) নিম্ন-মধ্যবিত্ত (প্রায় দরিদ্র), ১

কোটি ৫০ লাখ (৩৩.৩%) মধ্য-মধ্যবিত্ত, আর ৬০ লাখ (১৩.৩%) উচ্চ-মধ্যবিত্ত। আর ২০০৪ সালের বন্যায় ইতোমধ্যে দরিদ্রদের ব্যপকাংশ দরিদ্রতর হয়েছে, নিম্ন-মধ্যবিত্তের একাংশ দরিদ্র গ্রুপে আর মধ্যবিত্তের একাংশ নিম্নবিত্ত গ্রুপে যুক্ত হয়েছে।

গত ২০ বছরে (১৯৮৪-২০০৪) গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যা বেড়েছে (৮.৪ কোটি থেকে ১১ কোটি) ২ কোটি ৬০ লাখ যার মধ্যে আমার হিসেবে ২ কোটি ৪০ লাখ দরিদ্র (৯২.৪%)। গত ২০ বছরে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনুপাত বেড়েছে মোট গ্রামীণ জনসংখ্যার ৬৩% থেকে এখন ৭১%-এ; একই সময়ে নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্তের অনুপাত কমেছে ২৮.৫% থেকে এখন ২৪%-এ; আর জনসংখ্যায় ধনীদের আনুপাতিক হারও কমেছে ৩.৮% থেকে এখন ২%-এ। অর্থাৎ দারিদ্র্য বেড়েছে; মধ্যবিত্তের (বিশেষতঃ নিম্ন ও মধ্য-মধ্যবিত্তের) ঘটেছে অধোগতি; আর ভূমিসহ অন্যান্য বিত্ত পুঞ্জিভূত হয়েছে কিছু মানুষের হাতে (যারা ১১ কোটি গ্রামীণ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র ২০ লাখ)।

গ্রামীণ দারিদ্র ও সামাজিক বৈষম্য বনাম ভূমি মালিকানা

সরকারী হিসেবে বাংলাদেশের ৫৬% মানুষ দরিদ্র—যাদের ৭৬% গ্রামে আর ২৪% শহরে বাস করেন (আদমশুমারী ২০০১)। আর গ্রামীণ দরিদ্রদের অর্দ্ধেকই সরাসরি কৃষিকাজ নির্ভর। সরকারী হিসেবে গ্রামের প্রায় সব ভুমিহীনই দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন।

গ্রামীণ ভূমিহীন পরিবারের গড় স্থায়ী সম্পদের মূল্যমান ধনীদের (যাদের ৭.৫ একর অথবা তার বেশি জমির মালিকানা আছে) চেয়ে ১৬ গুণ কম (সরকারী তথ্য)। দরিদ্রদের আয়ের অধিকাংশ (৮৭%) খাদ্য বাবদ ব্যয় হয়, যেটা অদরিদ্রদের ক্ষেত্রে ৩৭%, আর ধনীদের ক্ষেত্রে বড় জোর ১০%। অর্থাৎ জীবনমানের অন্যতম মাপকাঠি খাদ্য বহির্ভূত ব্যয়-এর নিরিখে ভূমি-দরিদ্রদের প্রান্তিকতা সুস্পষ্ট।

গ্রামে ভুমি মালিকানা দিয়েই নির্ধারিত হয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নারীদের প্রতি বৈষম্য মাত্রা। যেমন নারীদের শিক্ষার সাথে পরিবারের জমি মালিকানার সম্পর্ক সরাসরি। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়—যেমন সরকারী স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠানেও ধনীরা গরীবদের তুলনায় পাঁচগুণ বেশী সুবিধা ভোগ করেন।

এমনকি খানায় বিদ্যুত সুবিধার ক্ষেত্রেও জমি-মালিকানা নির্দ্ধারক ভূমিকা পালন করে। এখানেও বৈষম্য স্পষ্ট। যে সব গ্রামে বিদ্যুত আছে (দেশের প্রায় ৯০,০০০ গ্রামের মধ্যে ৪০,০০০ গ্রামে) সে সব গ্রামে ধনী পরিবারের ৯০%-এর উর্দ্ধে আর দরিদ্র পরিবারের মাত্র ২১%-এ বিদ্যুত সংযোগ আছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যটি এমনি যে তা সুপেয় পানির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য– আর্সেনিক আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা আনুপাতিক হারে দরিদ্রদের মধ্যে ধনীদের তুলনায় অনেক বেশী (পুষ্টিহীনতা ও স্বল্প আয় প্রধান কারণ) যে কারণে বলা হচ্ছে "আর্সেনিকোসিস দারিদ্রের– রোগ"।

ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের জমি-জলা-বনসম্পদ বঞ্চনা

বাংলাদেশ একক জাতি সত্ত্বার রাষ্ট্র নয়। এ দেশে জনসংখ্যার ১.২% মানুষ (অথবা পরিবার বা খানা) ৩২ টি বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বা নিয়ে গঠিত। দুর্ভাগ্য হলেও সত্য যে তাদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি পর্যন্ত নেই।

ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের ভূমি অধিকারও স্বীকৃত নয় অথবা যতটুকু আছে তাও সহজে হরণ-যোগ্য। অন্যের দ্বারা এদের ভূ-সম্পত্তির জবর দখল যথেষ্ট বিস্তৃত। সমতলের সাঁওতালদের ভূমি-হারানোর প্রক্রিয়া সমতলের বাঙ্গালীদের চেয়ে জোর তালে চলে। সাঁওতালদের ৭২% এখন ভূমিহীন। আর পাহাড়ী ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের অবস্থা আরও খারাপ। গত তিন দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের তুলনামূলক সংখ্যা কমেছে আর আমদানী করা বাঙ্গালীদের সংখ্যা বেড়েছে। পাহাড়ীরা হারিয়েছে ভূমি-বনাঞ্চল আর সেটলার বাঙ্গালীদের কতিপয় দুর্বৃত্ত আমরা-প্রশাসনের সাথে যোগসাজসে তা দখল করেছে। পঞ্চাশ বছর আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বার মানুষের আনুপাতিক হার ছিল ৭৫%, আর এখন তা মাত্র ৪৭%। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া দুর্বল; আর ভূমি কমিশন কার্যত নেই বললেই চলে।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভূ-সম্পত্তি গ্রাস

পাকিস্তানের সামন্ত-সেনাশাসকেরা জন্ম সূত্রেই ছিলেন বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী বিরোধী। যে কোন কায়দায় ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত, দেশচ্যুত করা গেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙ্গালী জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করা সোজা হবে– এ ভাবনা থেকেই পাকিস্তানী সেনা শাসকেরা কালক্ষেপণ না করে ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে "শত্রু সম্পত্তি আইন" (Enemy Property Act) জারী করে। যে আইনের মূলমন্ত্র ছিল হিন্দুস্থান=শত্রুস্থান, ও হিন্দু=শত্রু। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, সংবিধান, মানবাধিকার, জন্মসূত্রে মালিকানার বিধান– এসবের পরিপন্থী হলেও শত্রু সম্পত্তি আইনটি কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী কালে বাতিল ঘোষিত হয়নি; নাম পরিবর্তন হয়েছে মাত্র– নূতন নাম, অর্পিত সম্পত্তি আইন (Vested Property Act)। বিষয়টি যেহেতু অন্যের জমি-সম্পত্তি বেদখলের চেয়েও অনেক গভীরের– একটি ধর্মনিরপেক্ষ, অসাম্প্রদায়িক দেশে ধর্মভিত্তিক উগ্র সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি ও পুন:সৃষ্টির– সেহেতু গভীর মনোযোগের দাবিদার।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের মারপ্যাচে ১০ লাখ হিন্দু খানা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে (মোট হিন্দু খানার ৪০%)। এ এই আইনে ভূমি-চ্যুতির পরিমাণ ২১ লাখ একর যা হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল ভূমি মালিকানার (আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায়) ৫৩%। ক্ষতিগ্রস্ত ২১ লাখ একরের প্রায় ৮২% কৃষিজমি, ১০% বসতভিটা, ২% বাগান, ২% পুকুর, ১% পতিত ও ৩% অন্যান্য। ক্ষতিগ্রস্ত খানা প্রতি গড় জমি-ক্ষতির পরিমাণ ২৮৩ ডেসিমেল, যার মধ্যে ২১৯ ডেসিমেল (আইনে) সরাসরি ক্ষতি আর বাদবাকী ৬৪ ডেসিমেল ক্ষতি পুনরুদ্ধার প্রচেষ্টা ও ক্ষতিজনিত আর্থিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে ব্যয়িত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত খানার ৭৮% হারিয়েছেন কৃষি জমি, ৬০% হারিয়েছেন বসতভিটা ও ২০% হারিয়েছেন অন্যান্য ভূ-সম্পত্তি। অর্পিত সম্পত্তি আইনের প্রভাবে ভূমিচ্যুতির পাশাপাশি ব্যাপকহারে স্থানান্তরযোগ্য সম্পদচ্যুতিও (movable assets) ঘটেছে। আইনে ক্ষতিগ্রস্ত হবার আগের তুলনায় বর্তমানে এ সম্পদ প্রায় ৬.৫ গুণ হ্রাস পেয়েছে। অর্পিত সম্পত্তি আইনে আর্থিক ক্ষতির (ভূমি-জলা ও স্থানান্তর যোগ্য সম্পদ) মোট মূল্যমান হবে এখনকার (২০০৪ সালের) বাজার দরে কমপক্ষে ২৩০,৫২০ কোটি টাকা, যা আমাদের বর্তমান মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৭০%। আর্থিক এ ক্ষতি মোট প্রকৃত ক্ষতির একটি অংশ মাত্র। আসলে শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে প্রকৃত ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নিরূপণ সম্ভব নয়। কারণ মনুষ্য দুর্দশা, বঞ্চনা, জোরপূর্বক পারিবারিক বন্ধন বিচ্যুতি, মানসিক যন্ত্রণা, শারিরীক বিপর্যয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ভয়-ভীতির কারণে বিনিদ্র রজনী যাপন, মা'এর পুত্রশোক আর সন্তানের

মাতৃশোক, মাতৃভূমি থেকে জোরপূর্বক উচেছদ, মানব সম্পদ বিনষ্ট, স্বাধীনতাহীনতা - এ সকল ক্ষতির আর্থিক মূল্যমান নির্দ্ধারণ করা কোন হিসাব বিশারদের পক্ষেই সম্ভব নয় ।

গত ৩৫ বছরে বিভিন্ন সরকারের আমলে ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন । এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০% ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫% হয়েছে ১৯৬৫-৭১ সনের মধ্যবর্তী সময়ে । মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২০.৬% ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩.৬% ঘটেছে ১৯৭৬-৯০ সনের মধ্যবর্তী সময়ে ।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভূক্তিকরণ ও পরবর্তীতে সেগুলির বেদখল প্রক্রিয়াটি জটিল । এই প্রক্রিয়ার দুই প্রধান নায়ক হলেন - স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠি ও ভূমি অফিস (তহসিল ও এ সি ল্যান্ড) । সম্পদ দখল হয়েছে প্রধানত পাঁচ ভাবে:

১. স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সাথে যোগসাজসে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন (৬৩% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
২. ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন (৪২% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
৩. স্থানীয় প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন ধরণের বল প্রয়োগ করেছেন– প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র, মাস্তান, জোরপূর্বক বাড়ী থেকে উচেছদ, দেশত্যাগে বাধ্য করা, ইত্যাদি (৩০% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য),
৪. প্রকৃত মালিক/উত্তরাধীকারীদের একজনের মৃত্যু অথবা দেশত্যাগ শত্রু/অর্পিতকরণের কারণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৩৩% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য);
৫. স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে ভূসম্পত্তি দখল করেছেন (১৬% ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য) ।

'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টি কোন অর্থেই হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা নয় । যারা বিষয়টিকে এভাবে দেখাতে চান তাদের উদ্দেশ্য অত্যন্ত হীন ও সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক । বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করার একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র, যে প্রক্রিয়ায় লুটপাটের ভাগীদার হয় গুটি কয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি/শ্রেণী/গোষ্ঠি । সম্পত্তি হিন্দুর না'কি মুসলমানের না'কি সাঁওতালদের তাতে তাদের কিছুই আসে যায় না । সম্পত্তি সম্পত্তি কি না এবং কার সম্পত্তি/কোন অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজে বেদখল করা যায় সেগুলিই জোরদখলকারী দুর্বৃত্তদের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় । এ দিক থেকে সমস্যাটি হ'ল একদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ১০ লাখ হিন্দু পরিবার (যারা ২১ লাখ একর ভূমিসহ বহুধরণের সম্পদ খুইয়েছেন) আর অন্যদিকে ৪ লাখ ভূমি-দস্যু সম্পদ-জবরদখলকারীর একটি গোষ্ঠি । কারণ-পরিণাম সম্পর্কের বিচারে এই ৪ লাখ জবরদখলকারী দুর্বৃত্তদের ধর্মীয় পরিচিতি আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় । যদি ধরেও নেই যে এই ৪ লাখ জোরদখলকারীর সকলেই মুসলমান নামধারী, সে ক্ষেত্রে তারা এ দেশের মোট মুসলমান জনগোষ্ঠির মাত্র ০.৩২ ভাগ । অর্থাৎ আমাদের দেশের মুসলমান জনগোষ্ঠির ৯৯.৬৮ ভাগই (যাদের অধিকাংশই দরিদ্র থেকে মধ্যশ্রেণীভুক্ত) অন্যের সম্পদ জোরদখলের সাথে কোন ভাবেই সম্পৃক্ত নন । ধর্ম-বর্ণ নিবিশেষে যে দেশের মানুষ ব্রিটিশ উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন করেছেন এবং যে দেশের মানুষ পাকিস্তানী সামন্ত শাসক-শোষক বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন সে দেশে 'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টিকে যারা হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করছেন তাদের সুদূরপ্রসারী হীন সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথেষ্ট মাত্রায় সচেতন হতে হবে । অন্যথায় স্বাধীনতা ও মুক্তির অন্তর্নিহিত মূল চেতনাটিই বিনষ্ট হয়ে যাবে । অসম্ভব হয়ে পড়বে সমগ্রক ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার ।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পদ যারা লুণ্ঠন করেছেন তাদের কেউই লুণ্ঠনকালীন সময়ে গ্রামের দরিদ্রশ্রেণীভুক্ত ছিলেন না, অধিকাংশেই ছিলেন স্থানীয় প্রভাববলয়ের মাতব্বর গোষ্ঠিভুক্ত ও অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল ব্যক্তি। অন্যের সম্পদ লুণ্ঠন করা তাদের অন্তর্নিহিত চরিত্রের অংশ; সেটাই তাদের ধর্ম এবং সে ধর্মই তারা পালন করেছেন। এই প্রক্রিয়ায় অন্যায় প্রশ্রয়কারী রাষ্ট্রযন্ত্র ও রাজনীতির সাথে তাদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ সুস্পষ্টভাবে কাজ করেছে। জোরদখলকারী সুবিধাভোগীদের রাজনৈতিক অবস্থান চমকপ্রদ - তারা সদা-সর্বদা সরকার ও ক্ষমতার কাছাকাছি।

জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনে সীমিত, বাস্ড়বে অনুপস্থিত

জমি-সম্পত্তিতে নারীর অধিকার– আইনগতভাবে সীমিত, আর বাস্তবে নেই বললেই চলে। নারীর ক্ষমতায়নে এ এক অন্যতম বাধা। সম্পত্তির উত্তারাধীকার আইন, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ, সামাজিক প্রাকটিশ– এ সবই নারীর প্রতি বৈষম্য চিরস্থায়ীকরণের অন্যতম মাধ্যম। এ দেশে নারীর উত্তরাধীকার আইন ধর্মভিত্তিক "পার্সোনেল ল" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত– মুসলিম ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে ***শরিয়া*** আইন, আর হিন্দু ধর্মের নারীর ক্ষেত্রে ***দায়ভাগ আই***ন। শরিয়া আইনে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার সীমিত-স্বীকৃত, আর দায়ভাগ আইনে উত্তরাধিকার স্বীকৃত নয়। বাস্তবে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সম্পত্তিতে নারীর উত্তরাধিকার আসলে কার্যকরী নয়। মুসলিম আইনে সীমিত-স্বীকৃতি থাকলেও এ দেশে মুসলিম নারী সম্পত্তির মালিকানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ন। এ ক্ষেত্রে "গুড সিস্টার" কনসেপ্টটি পুরোপুরি কাজ করে। "গুড ব্রাদার" মূল্যবোধ অন্তত: সম্পত্তির মালিকানার ক্ষেত্রে কাজ করে না। একদিকে পিতৃতান্ত্রিকতা আর অন্যদিকে ব্যাপক দারিদ্র– উভয়ই সম্ভবত এ অবস্থা জিইয়ে রাখতে ভূমিকা রাখছে। যে কারণে হিন্দু উত্তারাধিকার আইনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আর মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের বৈষম্যমূলক ধারণাগুলি সংশোধনের জন্য প্রগতিশীল নারী আন্দোলনসহ সংশ্লিষ্ট নাগরিক সমাজ এখন যথেষ্ট মাত্রায় সোচ্চার।

মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও প্রান্ড়িকতা– জল-জলায় অধিকার নেই

এ দেশে ১ কোটি ৩২ লাখ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকার জন্য জল-জলা সংশ্লিষ্ট পেশার সাথে সম্পৃক্ত। মৎস্যখাতে সার্বক্ষণিক সরাসরি কাজ করছে ১২ লাখ মানুষ, আর ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ কাজ করছে ঋতুভিত্তিক-সাময়িক। ১ কোটি ৩২ লাখ মৎস্যজীবির ৮০ লাখই দরিদ্র। সদস্য-সদস্যাসহ মৎস্যজীবি পরিবারে মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যাদের অর্দ্ধেকের বেশী যে কোন মাপকাঠিতেই দরিদ্র এবং যাদের দৈনন্দিন আয়-প্রবাহ অতিমাত্রায় অনিশ্চিত।

মৎস্য খাতের সাথে সম্পৃক্ত ৪৩ লাখ হেক্টর জলাভূমি ও ৭১০ কিলোমিটার উপকূল। বছরে আনুমানিক প্রায় ১৭-১৮ লাখ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন জাতীয় অর্থনীতিতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখছে। মাছ রপ্তানী থেকে রপ্তানী আয় ১৯৮৬-৮৭ সালে ১ কোটি ৬ লাখ ডলার থেকে ১৯৯৯-২০০০ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৩ কোটি ৫০ লাখ ডলারে। রপ্তানী আয় তিনগুণ বৃদ্ধি পেলেও মৎস্যজীবিদের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতা একচুলও কমেনি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়লেও যে দারিদ্র-বৈষম্য হ্রাস নাও হতে পারে– এ দেশের চলমান মৎস্য খাত তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ এ সমীকরণ পরিবর্তন সম্ভব– যখন মৎস্য খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়বে আর সেই সাথে মৎস্যজীবিদের দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। বিষয়টি জল-জলায় প্রকৃত

মৎস্যজীবিদের মালিকানা ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। বিষয়টি প্রকৃত অর্থেই জলা- সংস্কারের (aquarian reform)।

এদেশে এখন ১ কোটি ৩২ লাখ মৎস্যজীবিদের মাত্র ১০% এ পেশার সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের মতে জল-জলা সমৃদ্ধ বাংলাদেশে মৎস্যজীবিকার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত মানুষের অনুপাত দ্বিগুণ-তিনগুণ বৃদ্ধি সম্ভব যদি দরিদ্র-অভিমুখী নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা যায়, যেখানে মূলনীতি হবে "জাল যার জলা তার"। বিশেষজ্ঞদের মতে এর ফলে জাতীয় উৎপাদনে মৎস্য খাতের ভূমিকা হতে পারে শস্য-কৃষির সমতুল্য, এবং আয়-খাদ্য-পুষ্টি সংক্রান্ত দারিদ্র্য (income and nutrition poverty) দূরীকরণ হতে পারে ব্যাপক। এসবই মৎস্য খাতে ১ কোটি মানুষের দারিদ্র্য হ্রাসে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

মৎস্যজীবি মানুষের দারিদ্র্য ও প্রান্তিকতার প্রধান কারণ হ'ল জল-জলায় আইনসঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত (legal and justiciable) অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা। জল মহাল লীজ-চুক্তি আর্দ্র ভূমিতে তাদের আইনগত অধিকার/অভিগম্যতা নিশ্চিত করার প্রধান মাধ্যম। আইনগতভাবেই জল মহাল লীজ নেবার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবিদের-সমবায় অগ্রাধিকার পাবার কথা। বাস্তব অবস্থা উল্টো। সম্পদবান দুর্বৃত্তরা বিভিন্ন ধরণের দুর্নীতি-কারচুপির মাধ্যমে জলমহাল লীজ নেন এবং/অথবা লীজ গ্রহণকারীর কাছে কমিশন নেন (নিয়মিত অথবা এককালীন)। জলমহালের অকশন মূল্য সাধারণত: খুবই কম। ফলশ্রুতিতে সম্পদবান লিজ-হোল্ডার প্রকৃত মৎস্যজীবিদের শুধু বঞ্চিতই করছেন না তাদের শ্রমের ফসল (জলা-খাজনা) আত্মসাৎ করছেন; মুনাফার হার এক্ষেত্রে ১০০০%। এ অবস্থা চলতে থাকলে দরিদ্র মৎস্যজীবির দারিদ্র্য হ্রাস (দূরীকরণ আরো পরের কথা) অসম্ভব। একথা আরো সত্য এ জন্য যে এ দেশে মোট চিহ্নিত ৮৩০,৩৫৬ একর খাস-জলাভূমির মাত্র ৫% এ পর্যন্ত দরিদ্রদের মধ্যে লিজ দেয়া হয়েছে অর্থাৎ ৯৫% বেদখল-জোরদখল করে আছেন জল-দস্যুরা।

বাংলাদেশে মাছ বাজারজাতকরণ এক জটিল প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় থাকে কমপক্ষে ৬ ধাপের মধ্যস্বত্বভোগী। এসব মধ্যসত্ত্বভোগীরা 'ভ্যালু চেইনে' তেমন কোন ভ্যালু সংযোজন করে না অথচ প্রচুর মুনাফার লোভে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের শোষণ করার মাধ্যমে তাদের আয়-রোজগার কমাতে ভূমিকা রাখে।

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ– দারিদ্র্য ও বঞ্চনার এক নূতন মাত্রা

লোনা পানিতে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট শিল্প-বাণিজ্য বিষয়টি এ দেশে দারিদ্র্য বঞ্চনার ইতিহাসে এক নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। এদেশে ১৫-২০ লাখ দরিদ্র শ্রমজীবি লোনা পানিতে চিংড়ি চাষের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার বিষয়ক আলোচনা-বিশ্লেষণ ও নীতি-কৌশল নির্ধারণে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হওয়া উচিত।

বাংলাদেশের প্রায় ৩২ লাখ হেক্টর উপকূল অঞ্চলের ২০ লাখ হেক্টর চাষযোগ্য। এসব অঞ্চলের বিস্তৃতি ১৫ জেলার ৯৮টি উপজেলায়। দেশের মোট ১৪ কোটি জনসংখ্যার ২ কোটির বসবাস উপকূলীয় অঞ্চলে। উপকূলের মোট জমির ১০ লাখ হেক্টর এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রত্যেক দিন জোয়ার-ভাটার আওতায় থাকে; শুষ্ক মৌসুমে লবণাক্ততা বাড়ে; জমি লবণাক্ত হয়ে পড়ে। এসব কারণে উপকূল অঞ্চলে ফলনের তীব্রতা স্বল্প।

বন্যা আর লবণ পানি থেকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় দক্ষিণাঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে বাঁধ নির্মাণ (পোল্ডারসহ) কাজ শুরু হয় ষাটের দশকে। পোল্ডার নির্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চাষের আওতায় জমি বৃদ্ধি এবং কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দুর্বৃত্তদের ঠেলায় তা সম্ভব হয়নি। আসলে যা হয়েছে তা হল: অভ্যন্তরীণ (দেশজ) মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট; ফসল উৎপাদন ব্যাহত; চিংড়িসহ মিঠাপানি ও লবণ পানির প্রাকৃতিক মৎস্য বিচরণ ও বংশ-বিস্তার ক্ষেত্রসমূহ সঙ্কুচিত হওয়া ইত্যাদি। আর সত্তরের দশকে আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি মাছের চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে পোল্ডারে চিংড়ি চাষ বাড়লো। পোল্ডারে জলাবদ্ধতার কারণেও চিংড়ি চাষ বাড়লো। সেইসাথে ১৯৮০-৮৫-এর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিংড়ি চাষকে যখন শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেয়া হল সাথে সাথে চিংড়ি চাষ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রাতিষ্ঠানিক প্রণোদনা পাবার কারণে উচ্চ মুনাফার ব্যবসায় রূপান্তরিত হল। অতএব একদিকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিকাজ ত্বরান্বিত করার নামে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ (৬০-৭০ দশকে), আর অন্যদিকে ভাল-মন্দ বিচার না করে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (৮০-৮৫ সালে) চিংড়ি চাষকে শিল্পের মর্যাদা দেয়ার ফলে ঘটে গেলো অঘটন– "উন্নয়ন"-এর সামাজিক অভিঘাত বিবেচনা না করার ফলে সৃষ্টি হ'ল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সীমাহীন দুর্দশার বিস্তৃত ক্ষেত্র। সালওয়ারী চিংড়ি মাছের উৎপাদন প্রবণতা বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে: ১৯৭৯-৮০ সালে এ দেশে মাত্র ২০,০০০ হেক্টর জমিতে চিংড়ি চাষ হতো, ১৯৮৮-৮৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৮,০০০ হেক্টরে, ১৯৯৩-৯৪-এ ১৩৮,০০০ হেক্টরে, আর ১৯৯৬-৯৭-এ ৪১০,০০০ হেক্টরে।

সুপার মুনাফার লোভে নির্বিচারে চিংড়ি চাষের আওতায় চলে এসেছে অতীতের সু-ফসলী ধানী জমিসহ উপকূলীয় এলাকার বাঁধের ভিতরের আর বাইরের সকল জমি, লবণ-উৎপাদনের জমি, পরিত্যাক্ত ও প্রান্তীয় জমি, ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল, আর্দ্রভূমি ইত্যাদি। অপরিকল্পিত ও বিস্ফোরণমূলক এ প্রবৃদ্ধি নির্বিচারে ধ্বংস করেছে প্রকৃতি-পরিবেশ-প্রতিবেশ সবকিছুই; পানির গুণগত মান লোপ পেয়েছে; জীব বৈচিত্র বিনষ্ট হয়েছে; ঔষধি গাছ-গাছলার স্বাভাবিক বিকাশ রূদ্ধ হয়েছে (এদেশে এখনও ৩২% মানুষ ঔষধি গাছ-গাছলা ভিত্তিক চিকিৎসা নির্ভর); গাছ-পালা ফলমূল-এর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিকাশ রূদ্ধ হয়েছে; লবণাক্ততা বিনষ্ট করেছে জমির প্রাকৃতিক গুণাবলী; হাঁস-মুরগীসহ গো-সম্পদ বিলুপ্ত প্রায় (প্রায় ২ কোটি মানুষের খাদ্যাভাসে প্রোটিন ঘাটতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে)।

চিংড়ি চাষের অঞ্চলে জমির লবণাক্ততা দানাদার ফসলের উৎপাদনশীলতা হ্রাস করেছে। জমিতে মাত্রাতিরিক্ত লবণের উপস্থিতি ফলন-বৃদ্ধি চক্রের উপর মারাত্মক ঋণাত্মক প্রভাব ফেলেছে। শুধু মাত্র একর প্রতি ফলনই হ্রাস পায়নি, এমনও হয়েছে যখন পুরো ফসলই মার গেছে। ফারাক্কা বাঁধ আর সেই সাথে শুস্ক মৌসুমে গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ বৃদ্ধির ফলে উপকূলীয় কৃষি জমিতে অম্লের (acid) পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, লবন-পানির জলাবদ্ধতা বেড়েছে এবং কাদামাটির প্রাকৃতিক গুণাগুণ লোপ পেয়েছে। এসবই ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত করেছে। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা পড়েছে হুমকির মুখে। শুধু তাই নয় চিংড়ি চাষের ফলে উপকূলীয় অঞ্চল জুড়ে পানির ভৌত, রাসায়নিক, ও জৈবিক গুণাবলী এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছে যা বিপন্ন করছে হাজার বছরের প্রকৃতি ও পরিবেশ। এ বিপন্নতা বংশ-পরম্পরা।

চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা প্রকৃতই দুর্বৃত্ত– দৌর্দন্ড প্রভাবশালী (ক্ষেত্র বিশেষে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী)। চিংড়ি ঘের-এর জমির মালিকানা হয় ব্যক্তিমালিকানাধীন অথবা সরকারী মালিকানাধীন (খাস)। ব্যক্তিমালিকানাধীন ঘেরে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জমির প্রকৃত মালিক প্রান্তিক অথবা ক্ষুদ্র কৃষক, যার কাছ

থেকে ঘেরের প্রভাবশালী মালিক চুক্তি ভিত্তিতে জমি নিয়ে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রেই প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক এসব চুক্তি করতে বাধ্য হন। বৃহৎ চিংড়ি ঘেরের মালিকেরা একই সময় অনেকের সাথে ২-৭ বছরের মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হন। বাৎসরিক চুক্তির আর্থিক মুল্যমান (হারি = contract money for leasing of land) একর প্রতি ৪,০০০-৬,০০০ টাকা। আধা-নিবিড় (semi-intensive) চিংড়ি ঘেরে গড়ে একজন চিংড়ি মালিক বছরে একর প্রতি পাচ্ছেন ২০০,০০০ টাকা কিন্তু জমির মালিক (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক) পাচ্ছেন মাত্র ৪০০০-৬০০০ টাকা। অনেক ক্ষেত্রেই ঘের মালিক কর্তৃক জোরপূর্বক অন্যের (প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকের) জমি দখল এবং/অথবা নাম মাত্র হারি (চুক্তির অর্থ) প্রদান না করার কারণে সংঘর্ষ-সংঘাত, মামলা-মোকাদ্দমার সূচনা ঘটে। একদিকে মামলা-মোকদ্দমার ব্যয়ভার বহন আর অন্যদিকে আয়-মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুত হতে বাধ্য হবার কারণে দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার পরিচালনে চড়া সুদে ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে ভূমিহীনতার প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত হয়েছে সম্পদ হারানোর প্রক্রিয়া– এসব মানুষ নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হয়ে ভিক্ষুকে রূপান্তরিত হচ্ছেন। নিজ মালিকানাধীন জমির উপর আইন সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে শরিক হতে বাধ্য হচ্ছেন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র কৃষক। এ লড়াইয়ে ঘের মালিকেরা প্রায়শই সশস্ত্র-পেশী শক্তি ব্যবহার করেন, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলসহ থানা-পুলিশ কোর্ট-এর উপর তাদের প্রভাব সীমাহীন। এমনকি প্রশাসনে পোস্টিং-ট্রান্সফারও তাদেরই হাতে। এ প্রক্রিয়ায় খুন-জখম-গুম-এর শিকার হচ্ছেন দরিদ্র-প্রান্তিক-ক্ষুদ্র জমির মালিক এবং এ অন্যায় প্রতিবাদকারী ব্যক্তি ও সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। অনেকেই এ প্রক্রিয়ায় নিজ এলাকা ত্যাগ করে দুর্বিষহ জীবন গ্রহণে বাধ্য হচ্ছেন। আবার ক্ষেত্র বিশেষে ক্ষুদ্র মালিকেরা যখন জমির ঋতু-ভিত্তিক লিজ দেন (অথবা দিতে বাধ্য হন; জানুয়ারী থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত) তখন লিজ পরবর্তী কয়েকমাসে কৃষিতে ধান উৎপাদনের চেষ্টা করলেও জমির প্রাকৃতিক উর্বরতা হ্রাসের ফলে ফলন তেমনটি পান না।

সরকারী মালিকানার খাস জমিতে বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের বিষয়টি জাল-জোচ্চুরি-দুর্নীতিতে ভরপুর। এক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন প্রশাসনের অন্য সবার সাথে আঁতাত করে চিংড়ি ঘের মালিকদের কাছে উৎকোচ নিয়ে খাস কৃষি জমির শ্রেণী পরিবর্তন (class change of khas land) করে থাকেন– কৃষি খাস জমি হয়ে যায় খাস জলা যা চিংড়ি চাষের জন্য লীজ পেয়ে যান সম্পদবান-প্রতাপশালী দুর্বৃত্ত ঘের মালিক; আবার ক্ষেত্র বিশেষে ঐ অশুভ আঁতাতের মাধ্যমে জাল দলিল করে ঘের মালিক বনে যান খাস জলা-জমির মালিক। অর্থাৎ অভিনব এসব পন্থা কার্যকরী হবার ফলে খাস জলা-জমির আইনী মালিক যাদের হবার কথা সেসব ভূমিহীন, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ সরাসরিভাবেই খাস জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হ'ন। দরিদ্র মানুষ তার অধিকার নিশ্চিত করার এ লড়াইয়ে নামলে খুন-জখম হ'ন, মামলা-মোকাদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন– দরিদ্রদের ভিক্ষুকায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বয়নের এও এক অভিনব পন্থা। সেই সাথে চিংড়ি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হিমায়িত কারখানায় আছে স্বল্পমজুরী, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশু শ্রম, শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরণের অসুস্থতা (fungal, instinal, respiratory diseases)। সুতরাং চিংড়ি-চাষ ও বাণিজ্য একদিকে যেমন গুটিকয়েক দুর্বৃত্ত ঘের মালিক, শিল্পপতি ও রপ্তানীকারকের আর্থিক ধন-সম্পদ বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে, আর অন্যদিকে ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জলা-জমির উপর তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবন-জীবিকাকে করে তোলে অনিশ্চিত।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ইতোমধ্যে উপকুলীয় ব্যাপক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তাসহ ব্যক্তিগত জীবনের নিরাপত্তার সকল শর্ত বিলুপ্ত করেছে। সাধারণ প্রশাসন, আইন শৃংখলা রক্ষার প্রতিষ্ঠান, বিচার বিভাগ,

ভূমি সংক্রান্ত অফিস-আদালত, সন্ত্রাসী বাহিনী ঘের মালিকদের পক্ষ নেবার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের দু'কোটি মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে দুর্বিষহ। বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ ওভার ইনভয়েশিং (যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে) ও আণ্ডার ইনভয়েশিং (রপ্তানীর ক্ষেত্রে)-এর মাধ্যমে কাস্টমস ও আয়কর বিভাগ আর বিশেষ ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতির ফাঁদে ফেলেছে যারা দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতিতে ইতোমধ্যেই অতিমাত্রায় দুর্নীতিগ্রস্ত। সুতরাং শেষ পর্যন্ত বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষ এ দেশে অথনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার অন্যতম মাধ্যম হিসেবেই কাজ করছে।

বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষের পক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে অর্থনীতি বিষয়ক সরকারী ও দাতাগোষ্ঠীর পরামর্শদাতারা প্রায়ই বাহ্যিকতা (exrnalities)-র বিষয়টি সযত্নে এড়িয়ে যান। সে ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক চিংড়ির বাজার মূল্যে যেসব মূল্য কোনভাবেই দেখানো হচ্ছে না সেগুলো হ'ল: উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষয়-ক্ষতি, বাস্তুচ্যুতির পরিমাণ ও অভিঘাত, পারিবারিক বন্ধনের বিচ্যুতি, ক্ষুধার্ত-অনাহারক্লিষ্ট মানুষের বিস্তৃতি, পানির দূষণ, নবায়নযোগ্য সম্পদের ক্ষয়, এবং মানবাধিকার লঙ্ঘন। এসব ব্যয়ের কোনটিই কল্পিত নয়, সবই বাস্তব। এসব ব্যয়ভার বহন করছেন বর্তমান ও করবেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম। সুতরাং বাণিজ্যিক চিংড়ি চাষকে bad economics বলাই যথেষ্ট হবে না, তা পরিবেশগতভাবে আত্মঘাতি (ecologically suicidal), আমার মতে সামাজিকভাবে নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়ার অনুঘটক (socially impoverishing), এবং অর্থনৈতিকভাবে অন্যায় (economically unjust)। আমার মতে এসবই লোনা পানি সম্পদে কৃষি-জলা সংস্কারের যুক্তিকে শক্ত পায়ে দাঁড় করায়।

খাস জমি ও জলা– কৃষকের স্বপ্ন যা বাস্ড়বায়িত হয়নি কিন্তু হতেই হবে

ঔপনিবেশিক "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" (১৭৯৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রবর্তিত) জমিদারদের প্রজাপীড়নের সুযোগ দিল। এ নিয়ে কৃষক– জমি ও জলার উপর তার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায়ে লড়াই-সংগ্রাম করেছে। কৃষকের রক্তাক্ত সংগ্রামের ফসল "বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন-১৮৮৫" যদিও বা অর্জিত হয়েছিলো, শেষ পর্যন্ত তা কৃষকের অধিকার সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছিলো। অবশেষে ব্রিটিশরা এ দেশ ছেড়ে যাবার পর ১৯৫১ সালে করা হলো "পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন (EBSATA-1951)" – যেখানে আইনের দৃষ্টিতে কৃষককে তার ন্যায্য অধিকার পুরোপুরিভাবে দেওয়া হয়েছিলো। আইনে স্পষ্ট বলা ছিল "***রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোন অন্তর্বর্তী সত্ত্বা থাকবে না***"।

খাস জমির রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও পুনর্বন্টনের মাধ্যমে এদেশের কৃষক প্রজাসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হবে এমনটি আশা করা হয়েছিলো। দু:খের বিষয়, পাকিস্তানের নব্য ঔপনিবেশিক সামন্ত সেনাপ্রভুরা EBSATA কে কৃষক স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহৃত হতে দেয়নি। EBSATA-কে তারা বার বার পরিবর্তন করে। উদ্দেশ্য ছিল, দেশে এমন একটি শ্রেণীকাঠামো তৈরী করা যা ঐসব সেনাশাসকদের হীন স্বার্থ হাসিল করতে পারে। ফলে পাকিস্তানী শাসনের পুরো সময়কালে খাস জমির বন্টন কর্মসূচী প্রকৃত গরীব কৃষকশ্রেণীর ভাগ্য উন্নয়নে ভূমিকা রাখেনি। পরবর্তীতে ১৯৭১-এ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে কৃষকের স্বপ্ন লালিত ছিল দেশের সম্পদের উপর নিজেদের সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা। দেশের গরীব, ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী এবং দু:স্থ ও হতদরিদ্র মানুষগুলো খাস জমি ও জলার উপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছিলো। তাদের সে আশা-আকাঙ্ক্ষাও ব্যর্থ হয়েছে। খাস জমি-জলার বন্টন প্রক্রিয়ায় গ্রাম্য টাউট, মাতব্বর, অসৎ রাজনীতিবিদ ও শহুরে উঠতি বুর্জোয়াদের একটা পরজীবী আঁতাত (অর্থাৎ দুর্বৃত্তায়ন-চক্র) গড়ে উঠেছে, যা বাংলাদেশে প্রকৃত মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বড় বাধা।

গত তিন দশকে বাংলাদেশে ভূমিহীন মানুষের সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর একটি অংশ শহরে পাড়ি জমিয়েছে এবং বেঁচে থাকার তাগিদে বড় বড় শহরগুলোর বস্তিতে মানবেতর জীবন যাপন প্রণালী মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। বৃহৎ অর্থে কৃষি সংস্কারের (agrarian reform) আওতায় খাস জমির সুষম বন্টনই কেবল গরীব ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অধিকার সংকোচনের ফলে সৃষ্ট এই rural push migration-কে মোকাবেলা করতে পারতো। এটি আমাদের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীরও অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য হতে পারতো। সরকারের তরফ থেকে ঘোষণাপত্রের কমতি ছিল না। বলা হচ্ছিল "খাস জমি গরীব জনসাধারণের প্রাপ্য।" বাস্তবে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছুই করা হয়নি। আসলে খাস জমির ইস্যুকে এতটাই অবহেলা করা হয়েছে যে, এমনকি দেশে যে কি পরিমাণ খাস জমি রয়েছে এর কোন স্বচ্ছ হিসাব সরকারের জানা আছে বলে মনে হয় না (তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদীয় কমিটি আছে!)।

আমার হিসেবে দেশে বর্তমানে চিহ্নিত খাস জমির (identified khas land) পরিমাণ ৩৩ লাখ একর: কৃষি খাস জমি ৮ লাখ একর, অকৃষি খাস জমি ১৭ লাখ একর, জলাভূমি ৮ লাখ একর। এই হিসাব প্রকৃত খাস জমির চেয়ে অনেক কম; কারণ জমির একটা বৃহৎ অংশ বিভিন্ন কারণে এখনও সরকারী নথিতে অন্তর্ভুক্ত নয়। খাস জমির সরকারী হিসাব মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। সরকারী হিসাবেই ২৩ লাখ একর খাস জলাভূমি এবং ৭১ হাজার একর খাস কৃষি জমির গড়মিল আছে।

সরকারী হিসাবে বলা হচ্ছে, চিহ্নিত ৮ লাখ ৩ হাজার ৩০৮ একর খাস কৃষি জমির ৪৪% গরীব, ভূমিহীন ও দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। গবেষণায় এ হিসেবে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আসলে খাস জমির ৮৮% ধনী এবং প্রভাবশালীরা অবৈধভাবে দখল করে আছে। অর্থাৎ যাদের জন্য খাস জমি সেই গরীব ও ভূমিহীন জনগণের সত্যিকার অধিকারে আছে মাত্র ১২% খাস কৃষি জমি। আর বন্টনকৃত খাস জমির সরাসরি সুবিধাভোগীদের কমপক্ষে ২০% আগে থেকেই ভূমি মালিক।

খাস জমির বিতরণ প্রক্রিয়াটা দরিদ্র কৃষকের জন্য বড় ধরণের বিড়ম্বনা। খাস জমির বন্টন প্রক্রিয়ার প্রধান নায়ক হলেন সরকারী ভূমি অফিসের কর্মকতা/কর্মচারী, স্থানীয় গণপ্রতিনিধি, এবং স্থানীয় প্রভাবশালী। মিলেমিশে এরা সৃষ্টি করেছে জমি-দস্যুর শক্তিশালী এক বলয়।

একজন ভূমিহীন ব্যক্তি খাস জমির সম্ভাব্য বন্টন তালিকায় স্থান পাবে কি পাবে না তা যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেগুলো হল: সে স্থানীয় প্রভাবশালীদের সমাজভুক্ত কিনা, সে তাদের একই রাজনৈতিক দলভুক্ত কিনা, তালিকা প্রণেতা তার কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোন সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নিতে পারবে কিনা, এবং ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে তার যোগাযোগ কেমন (?) ইত্যাদি ।

অতীতে অনেক ভূমিহীন তালিকাভুক্ত হয়েছেন অথচ শেষ পর্যন্ত জমির বরাদ্দ পাননি। বরাদ্দ না পাবার অন্যতম কারণসমূহ হল: সরকারী অফিসের সাথে যোগাযোগের অভাব, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সাথে বৈরী সম্পর্ক, খাস জমি অন্যের দ্বারা অবৈধভাবে দখল হওয়া, খাস জমির অপ্রতুলতা, অসম্পূর্ণ ও অনুপযুক্ত আবেদন পত্র।

খাস জমির অসম বন্টনের ক্ষেত্রে ভূমি অফিসের দুর্নীতিই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এক একর খাস জমি পাবার জন্য গড়ে ৭ - ১০ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। একখণ্ড খাস জমি বন্দোবস্ত পাওয়ার জন্য

একজন সুফল ভোগীকে গড়ে ৭২ কর্মদিবস ব্যয় করতে হয় (যা সরকার ঘোষিত এই কাজে প্রয়োজনীয় সময়ের ২৪ গুণ বেশি)।

খাস জমি-জলার বন্টন ও বন্দোবস্ত প্রক্রিয়াটি মূলত: স্বাধীনতা পরবর্তী ঘটনা। এ পর্যন্ত যত জমি বন্টিত হয়েছে তার বেশির ভাগই ঘটেছে ১৯৮১ - ১৯৯৬ সনের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৯১ - ৯৬ সনে খাস জমি বন্টনের অনুপাত ১৯৮১ - ৯০ সনের তুলনায় আপেক্ষিকভাবে বেশি ছিল। প্রথম ক্ষেত্রে ৭ বছরে ৫৬%, যেখানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ১০ বছরে ৩৬%।

বাজার অর্থনীতি (অথবা বাজার অন্ধত্ব: market fundamentalism অর্থে) এমনই যে দরিদ্র মানুষ জমি পাবেন কিন্তু ধরে রাখতে পারবেন না (issue of non retention and adverse inclusion)। গবেষণায় দেখা যায় যে ৫৪% সুফলভোগী বিভিন্ন কারণে জমির উপর তাদের অধিকার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। অন্য কথায় বলতে গেলে, ভূমিহীন গরীব জনগণের যে ক্ষুদ্র অংশটি খাস জমি পেয়েছেন তাদেরও প্রতি ২ জনে ১ জন খাস জমি বন্টনের ন্যূনতম সুবিধাটুকুও পায়নি। বন্টনকৃত খাস জমির উপর অধিকার টিকিয়ে রাখতে পেরেছে মাত্র ৪৬% সুফলভোগী (অর্থাৎ দলিল আছে, জমি চাষ করছেন এবং ফসল ঘরে উঠাতে পারছেন)। ভূমি অফিস ও আইন শৃংখলা রক্ষাকারীদের সাথে দখলকারীদের যোগসাজশ –জমি রক্ষা করতে না পারার প্রধান কারণ। ৫২% সুফলভোগী অবৈধ দখলকারীদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। যে সমস্ত কারণে ভূমিহীন মানুষ তাদের মধ্যে বন্টনকৃত জমি রক্ষা করতে পারেনি সেগুলো হল: অবৈধ দখলদাররা ক্ষমতাবান; স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর সাথে অবৈধ দখলদারদের যোগসাজশ সুদৃঢ়; আইন ধনী-সহায়ক; আইনগত জটিলতার বিষয়টিই বেআইনী; সরকারী সহযোগিতা – কাগুজে; সমস্যা সৃষ্টিকারী সরকারী কর্মকর্তারা এবং ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা প্রায়শই নিজেদের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে অভ্যস্ত; গরীবদের বিভক্ত রাখার জন্য অবৈধ দখলদাররা বিভিন্ন ধরণের কৌশল অবলম্বন করে। বাংলাদেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক কাঠামো বহাল থাকলে কোন দক্ষ ও কার্যকর ভূমি সংস্কার আদৌ সম্ভব কিনা এসব পরিসংখ্যান সেসব বিষয়েই সন্দেহের জন্ম দেয়।

সুফলভোগীদের ৪৬% এর অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভালো হয়েছে। ভালো হয়নি ৫৪% এর (যাদের মধ্যে ৩৬% এর অবস্থা অতীতের তুলনায় খারাপ হয়েছে)। অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি মূলত ২টি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত: (ক) ভূমির দখলি স্বত্ব ও ফসলের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, (খ) জমির পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে লাঙ্গল ও হালের বলদ সম্পদের উন্নতি– যে ২টি জিনিস নিশ্চিত হয়নি বলেই অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়নি। অর্থাৎ অদক্ষ ও অসম্পূর্ণ এবং সামগ্রিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কহীন খাস জমি বন্টন-কেন্দ্রিক ভূমি সংস্কারই সুফলভোগীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের জন্য আশির্বাদ নাকি অভিশাপ– প্রশ্নটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। দরিদ্র জনগোষ্ঠী একখন্ড খাস জমি প্রাপ্তির আশু সুবিধা অর্জনে দীর্ঘমেয়াদের সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে (করছেনও); বাজার অর্থনীতির মারপ্যাচে রক্ষা করতে পারছেন না বন্টিত খাস জমি-জলা (high non-retention rate); মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে "adverse inclusion"-এর শিকার হচ্ছেন; জোরদখলকারী জমি-জল-দস্যুরা সংগঠিত কিন্তু দরিদ্ররা অসংগঠিত; ঘুষসহ অন্যান্য অনেক বিধি বহির্ভূত ব্যয় করতেও দরিদ্ররা খুব একটা কুণ্ঠা বোধ করেন না

(করেন কি?)— এসব কারণে বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামোতে খাস জলা-জমির বিষয়টি দরিদ্রদের জন্য এক ধরণের অভিশাপের বিষয় হিসাবে গণ্য হতে পারে। আবার বর্তমান কাঠামোতে যখন দেখি যে খাস জমির সুফলভোগীদের ৪৬%-এর অর্থনৈতিক অবস্থা আগের তুলনায় ভাল হয়েছে– সেটা কিন্তু দুর্বৃত্তায়িত কাঠামোর মধ্যেও কিছুটা আশার লক্ষণ।

ভূমি–মামলায় জাতীয় অপচয়: ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের আরেকটি শক্ত যুক্তি

বাংলাদেশে ভূমি মামলার বিষয়টি যে জটিল এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এও সন্দেহাতীত যে জমি-জমা কিন্তু এখনও ব্যক্তির অর্থনৈতিক শক্তি, সামাজিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অন্যতম নির্ণায়ক। জমি-এমনিতেই দুষ্প্রাপ্য, আর আমাদের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে তা অধিকমাত্রায় দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং আমাদের দেশে একখন্ড জমি প্রাপ্তির এবং/অথবা জমি রক্ষার প্রতিযোগিতাও হবে বেশী। আবার "জমি না যম" এ প্রবাদটিও আছে। আর জমি যদি 'যম' হয় তাহলে জমি নিয়ে যে মামলা-মোকদ্দমা হবে তাও স্বাভাবিক। অথবা জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ-মনকষাকষি-মামলা-মোকদ্দমা-খুন-জখম-জালিয়াতি-বাটপারি-দস্যুতা (ভূমি-দস্যুতা, জল-দস্যুতা, বন-দস্যুতা) হয় দেখেই সম্ভবত জমিকে 'যম' বলা হয়। আবার জমি যেহেতু এক ধরনের নিরাপত্তা অথবা বীমা (ইন্সুরেন্স) সেহেতু জমি প্রাপ্তির আকাঙ্খাও অস্বাভাবিক নয়। অন্যদিকে রুশোর মত দার্শনিক অবশ্য বলেছেন "মানুষ যেদিন একখন্ড বাঁশের মাথায় লাল পতাকা গেড়ে মাটিতে বসিয়ে বললো– এটা আমার– সে দিনটিই ছিল সভ্যতার শেষ দিন"।

ভূমি মামলার পুরো বিষয়টি এখন পারিবারিক ও জাতীয়ভাবে এক বিশাল ও ক্রমবর্ধমান অপচয়ের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। ভূমি মামলায় জাতীয় অপচয়ের মাত্রা নিম্নরূপ:

চৌদ্দ কোটি মানুষের এদেশে মামলার দু'পক্ষ, তাদের পরিবারের সদস্য ও সাক্ষীসহ ভূমি-মামলার সাথে সম্পর্কিত মানুষের সংখ্যা হবে ১২ কোটি, যা বাংলাদেশের শতকরা ১০০ ভাগ পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার সমান (এদের প্রত্যেকেই যে মামলায় জড়িত তা নয়, কেউ কেউ একাধিক মামলায় জড়িত)। বছরে ভূমি-কেন্দ্রিক চলমান (operating) মামলার সংখ্যা (including pending cases) ২৫ লাখ, যা দেশের মোট চলমান মামলার ৭৭%। এ মুহূর্তে যেসব ভূমি-মামলা রায় অপেক্ষমান সেসব মামলায় বাদি-বিবাদি মিলে মোট ভোগান্তি-বর্ষ (sufferings-year) হবে ২ কোটি ৭ লাখ বছর। দেশে বছরে মামলাধীন ভূমির পরিমাণ হবে ২৩.৫ লাখ একর যা ক্রমপুঞ্জিভূত ভূমি মামলার কারণে ক্রমবর্ধমান। ভূমি নিয়ে প্রতি বছর যে সব মামলা হচ্ছে ঐসব জমির বর্তমান বাজার মূল্য ১,২৭,১০০ কোটি টাকা। সমগ্র দেশে ভূমি মামলাক্রান্ত পরিবার (বাদি-বিবাদিসহ) সমূহ বছরে ১২,৫২০ কোটি টাকার সম্পদ হারান। ভূমি মামলা-সংশ্লিষ্ট মোট আর্থিক ব্যয়ের পরিমাণ বছরে ২৪,৮৬০ কোটি টাকা, যার মাত্র ১% রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হয় (স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ইত্যাদি বাবদ), ৫০% ঘুষ (যার মধ্যে ৬৫% নেন পুলিশ-থানা, ১৫% ভূমি অফিস, ১৪% কোর্টের কর্মকর্তা)। এ মুহূর্তে সারা দেশে যারা ভূমি মামলায় জড়িত তারা মামলা পরিচালনে ইতোমধ্যে ২৫,০৩৯ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন, যা আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ১০%-এর সমান অথবা সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে মোট বরাদ্দের চেয়ে বেশী। প্রকৃতপক্ষে ভূমি মামলায় বাদি-বিবাদির প্রকৃত ব্যয় উল্লেখিত আর্থিক ব্যয়ের চেয়েও অনেক গুণ বেশী হবে, কারণ আর্থিক ব্যয়ে যেসব প্রকৃত ব্যয়ের আর্থিক মূল্য হিসেব করা হয়নি

তা হ'ল: মামলার কারণে অতিবাহিত সময়ের সুযোগ ব্যয় (opportunity cost); অনেক ধরণের বাহ্যিকতা-ব্যয় (externalities) যেমন শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের অর্থমূল্য, পরিবারের সদস্যদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে যে ব্যয় করা প্রয়োজন ছিল কিন্তু মামলার কারণে করা সম্ভব হয়নি তার অর্থমূল্য, মামলার কারণে সামাজিক সম্পর্কে যে চির ধরেছে তার অর্থ মুল্য, ভূমিকেন্দ্রিক ঝগড়া-বিবাদ-মারামারি-খুন-জখম-এর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার অর্থমূল্য, মামলার ফলে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পক্ষের পরিবারের যে মেয়েটি স্কুলে যেতে পারছে না অথবা স্কুলে যেতে-আসতে যাকে ঠাট্টা-বিরক্ত-বিব্রত (tease) করা হচ্ছে সেটার অর্থমূল্য; দুর্নীতির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির অর্থ মূল্য (cost of corruption) ইত্যাদি।

ভূমি মামলায় পারিবারিক অপচয় মাত্রাহীন। গবেষণালব্ধ সাম্প্রতিক কয়েকটি তথ্যে তা স্পষ্ট: গড়ে প্রতিটি ভূমি মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হ'ন ৪৫ জন মানুষ। গড়ে একটি ভূমি মামলা নিষ্পত্তিতে সময় লাগে ৯.৫ বছর। ভুমি মামলা পরিবারের সকল ধরনের দুর্দশা বাড়ায়– অর্থনৈতিক, শারীরিক, সামাজিক, মানসিক। মামলাক্রান্ত ১০০%-ই বলেছেন মানসিক যন্ত্রণা বৃদ্ধির কথা; ৬০% বলেছেন মামলার কারণে শারীরিক অসুস্থতার কথা; মামলাক্রান্ত পরিবারের ৯০%-এর আয় আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে; মামলার ব্যয় মিটাতে ৬০% পরিবার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা ব্যয় কর্তনে বাধ্য হয়েছেন; খাদ্য পরিভোগে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন ৭৫% পরিবার; আর ৬০% পরিবার মামলা চালাতে গিয়ে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় কমাতে বাধ্য হয়েছেন। ভূমি মামলার কারণে আয় হ্রাস ও প্রয়োজনীয় ব্যয় কর্তন বিষয়টি শুধুমাত্র ভূমি মামলায় সরাসরি জড়িত (বাদি ও বিবাদি)-দের জন্যই প্রযোজ্য নয়, তা তাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট মাত্রায় লক্ষণীয়। গড়ে মামলা প্রতি বাদি অথবা বিবাদি নির্বিশেষে প্রতিটি পক্ষের যে সম্পদ যা হ্রাস পেয়েছে তার বর্তমান বাজার মূল্য হবে ২,২৭,৯৯০ টাকা। বাৎসরিক সম্পদ হ্রাসের পরিমাণ, গড়ে প্রতি পক্ষের ২৩,৯৯৯ টাকা।

সূতরাং ভূমি মামলার রাজনৈতিক-অর্থনীতি বিশ্লেষণে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যা নির্দেশ করে যে সামগ্রিক কৃষি সংস্কার ছাড়া বিশাল এ পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ অসম্ভব। অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে ভূমি মামলা। সামগ্রিক দুর্বৃত্তায়নের কাঠামোতে ভূমি মামলা ঘুষ-দুর্নীতি বৃদ্ধিতে এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থা অকার্যকর করতে ভূমিকা রাখছে। ভূমি মামলায় পুলিশ দু'পক্ষের কাছেই ঘুষ খাচ্ছে। তবে যে বেশী ঘুষ দিচ্ছে পুলিশ তার স্বার্থ দেখছে, কিন্তু সর্বাত্মক চেষ্টা করছে মামলা যেন চিরস্থায়ী হয়। এ বিষয়ে ভূমি অফিস, কোর্ট সিস্টেম, স্থানীয় সরকার, উকিল-মোক্তার– কেউ কারো চেয়ে কম নন। দুর্নীতিগ্রস্ত ও অকার্যকর আইনশৃংখলা ও বিচার-এর সিস্টেমে সবচে বেশী লাভবান হচ্ছেন তারা যারা জোরপূর্বক জমি, জলা, চর, বন দখল করছেন। এবং তারাই কিন্তু দুর্নীতি ও সিস্টেমের অকার্যকারিতা চিরস্থায়ী করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন। ভূমি মামলায় সবচে বেশী দুর্দশা-ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা যারা দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা চালিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, মহিলা প্রধান খানা এবং অন্যান্য দুর্বল পক্ষ (অপেক্ষাকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু মানুষ ইত্যাদি)। ভূমি মামলায় বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে কেউই আসলে জেতেন না (loosing battle for both), উভয়েই হারেন। কারণ মামলায় গড় আর্থিক ব্যয় (অর্থমূল্য করা সম্ভব নয়, এমন ব্যয় বাদ দিলেও) যে পরিমাণ জমি নিয়ে মামলা হয় তার বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী। ভূমি মামলা মামলাক্রান্ত পরিবারের আর্থিকসহ অন্যান্য সকল উন্নয়ন-সহায়ক প্রয়োজনীয় ভিত ধীরে ধীরে দুর্বল করে: হ্রাস পায় পারিবারিক আয়; উৎপাদনশীল

কর্মকাণ্ডে সময় দেয়া দ্রুত হ্রাস পায়; আয়ের বড় অংশ মামলার পিছনে ব্যয় করতে গিয়ে পরিবারে স্বাস্থ্য-শিক্ষা-মানসিক সুস্থতার বিকাশ বিঘ্নিত হয়; পরিবারে খাদ্য পরিভোগ হ্রাসের ফলে পরিবারের শিশু-মহিলা-প্রবীণ সদস্যদের স্থায়ী স্বাস্থ্যহানি হয়; মামলাক্রান্ত পরিবারে হার্টের অসুখ, ডায়াবেটিকস, নিদ্রাহীনতা (ইনসোমনিয়া), গ্যাস্ট্রিক জাতিয় অসুস্থতা মামলাহীন পরিবারের তুলনায় অধিক। ভুমি মামলা পরিবারিক ও কম্যুনিটি বন্ধন এবং মানুষে মানুষে সৌহার্দ্য ও সংহতি (solidarity) বিনষ্ট করার মাধ্যমে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মনুষ্য সম্পর্কের বিনষ্টিকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। মামলার বাদি-বিবাদি নন অথচ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর (যাদের অনেকেই এমনকি ভূমিহীন) একাংশ যারা যে কোন কারণেই হোক না কেন সাক্ষী হিসেবে মামলার অংশ– মামলায় জড়িয়ে আস্তে আস্তে নিয়মিত আয়মূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিচ্যুতির ফলে দরিদ্রতর হয়ে পড়েন। ভূমি আইনের জটিলতা ও অসঙ্গতি; ভূমি আইন ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের জ্ঞানের অভাব (অথবা আবছা ধারণা); আইনের প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনায় সমস্যা; অনেক ক্ষেত্রেই সমস্যা-মিমাংসার ক্ষেত্রে অকার্যকর ও আইনের সাথে সঙ্গতিহীন বিচার; বিচারের রায় প্রভাবিত করার চেষ্টা (অনেক ক্ষেত্রে সফল প্রচেষ্টা); থানা-পুলিশ-ভূমিঅফিস-কোর্টের মানুষ-বিরুদ্ধ অবস্থান; প্রভাবশালী মানুষের (বিশেষত: রাজনীতিকদের ও স্থানীয় বাটপারদের) অবৈধ হস্তক্ষেপ (অনেক ক্ষেত্রে এটাও তাদের অবৈধ আয়ের অন্যতম উৎস); উকিল-মোক্তারের মক্কেল বিরোধী অবস্থান এবং অনৈতিক ও অপেশাদারসুলভ মানসকাঠামো (অনেক ক্ষেত্রে)– এসবই ভূমি মামলায় অপচয় বৃদ্ধিতে এবং প্রক্রিয়া প্রলম্বনে ভূমিকা রাখে।

সবকিছু মিলিয়ে আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন কাঠামোতে এদেশে ভূমি-মামলা ভাল তেমন কিছুই করে না, বিপরীতে মামলাক্রান্ত পরিবারের দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা বৃদ্ধি করে; মানব পুঁজি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে; সমগ্র সমাজ-অর্থনীতি-শিক্ষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-রাজনীতি-মনস্তাত্বিক জগত ভারসাম্যহীনকরণ ও কলুষিতকরণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে; সর্বোপরি স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ (freedom mediated) প্রক্রিয়া হিসেবে উন্নয়ন তথা মানব উন্নয়নে বড় ধরনের বাধা-বিপত্তির কারণ হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সম্পূর্ণ ভূমি-মামলার বিষয়টিকে ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখতে হবে।

ভূমি প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, আইন ও নীতিমালা: সংকীর্ণ স্বার্থ সংরক্ষণের জটিল প্রক্রিয়া

জমি ও জল– এদেশের মূল ও মৌলিক সম্পদ। অথচ ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা – উভয়ই এখনও উপনিবেশিক নিয়মেই চলছে। ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার মূল কাজ তিনটি: (১) রেকর্ড সংরক্ষণ, (২) রেজিস্ট্রেশন, (৩) সেটেলম্যান্ট। সম্পর্কহীন ও সমন্বয়হীন দুটো মন্ত্রণালয়ের তিনটে কর্তৃপক্ষ ভিন্ন ভিন্ন অফিসে এসব কাজ করে– এটাই ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনার অন্যতম সমস্যা। যা নিরসনে কোন কার্যকরী উদ্যোগ নেই। ***রেকর্ড সংরক্ষণের*** কাজটি করে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় তহসিল অফিস। যেহেতু ভূমির কেনাবেচা এবং উত্তরাধিকার সূত্র চলমান সেহেতু রেকর্ড সংরক্ষণের কাজটি (process of transfer of land right) জরুরী। ***রেজিস্ট্রেশনের*** কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সাবরেজিস্ট্রি অফিস। এ কাজটিও জরুরী কারণ এটা হ'ল recording of transfer। আর ***সেটেলম্যান্ট***-এর কাজটি করে আইন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সেটলম্যান্ট অফিস। এ কাজটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তখন যখন জনসংখ্যা ছিল কম আর চাষের আওতায় নূতন জমির হিসেব রাখা ও সংশ্লিষ্ট খাজনা আদায় প্রসঙ্গটি প্রযোজ্য ছিল (অর্থাৎ recording the expansion of cultivable acreage) –এখন এটা সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়। মালিকানা স্বত্বের আইনি রেকর্ড (official record of ownership

rights) সম্পন্ন করতে সম্পর্কহীন তিনটে সংস্থার উপস্থিতি– এটা নিজেই এক অপ্রয়োজনীয় জটিলতা। এ অপ্রয়োজনীয় জটিলতা দুর করে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সুসমন্বিত একক কর্তৃত্বে আনা গেলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হতে পারে।

জমি-জলার মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ, মামলা-মোকদ্দমা শুধু যে বেশি তাই নয় এ প্রক্রিয়া বাদি-বিবাদি নির্বিশেষে উভয়েরই নিঃস্বকরণে সহায়ক; এ প্রক্রিয়া সামাজিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করছে এবং সেই সাথে এদেশে সামাজিক পুঁজি বিকাশে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক। ধরুন জমি নিয়ে বিরোধ শুরু হল। নিস্পত্তির প্রধান পূর্বশর্ত হ'ল মালিকানার প্রমাণপত্র দাখিল করা। একই জমির মালিকানার দাবিদার তিন ব্যক্তির প্রথম ব্যক্তি মালিকানার প্রমাণপত্র হিসেবে দাখিল করলেন তহসিল অফিসের কাগজ, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাখিল করলেন সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসের কাগজ, আর তৃতীয় ব্যক্তি পেশ করলেন সেটেলম্যান্ট অফিসের কাগজ। আসলে ঐ জমির মালিক কে? তিনজনই তো ভূমি সংক্রান্ত executive body-র কাগজ দেখাচ্ছেন–আইনের দৃষ্টিতে তো তিনজনই মালিক। সে কারণেই বলা হয়ে থাকে যে বাংলাদেশের মানুষের জমি মালিকানা সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ একত্রিত করলে জমির পরিমাণ দাঁড়াবে এদেশে যত জমি আছে তার চেয়ে তিনগুণ বেশী। আসলে আমরা যাকে জমি রেজিস্ট্রেশন বলি তা আসলে দলিলের রেজিস্ট্রেশন (registration of deed)– জমির মালিকানার রেজিস্ট্রেশন নয়। জমির পরচা বা নকশা (RR-Record of Right) মিলালে হাজারো ত্রুটি দেখা যাবে। দ্বিতীয়ত কোন মালিকের জমি তার নামে নামজারি বা জমা-খারিজ (mutation) করার জন্য দুটো অফিসে যেতে হয়: সেটেলম্যান্ট অফিসে কার জমি কোনটা তার মানচিত্র আঁকা হয় (প্রথম সেটেলম্যান্ট সার্ভেতে লেগেছিল ৬০ বছর– ১৮৮০-১৯৪০; এরপর ১৯৫০-এ State Acquisition Settlement, তারপরে রিভিশন্যাল সেটেলম্যান্ট যা এখনও চলছে, কবে শেষ হবে কেউই জানে না); আর তহসিলদার, এসিসট্যান্ট কমিশনার (ভূমি), জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় প্রশাসক ইত্যাদি। এভাবে একই জমি বিভিন্ন ব্যবস্থায় মালিকানা বা নামজারি করার ফলে জমির মালিক হয়রানির শিকার হন। সুতরাং স্পষ্ট যে ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার পুরো সিস্টেমটি অযোগ্য, অদক্ষ, অকার্যকর, অস্বচ্ছ, দ্বৈত-মালিকানা সৃষ্টিতে সহায়ক, জাল রেকর্ড প্রণয়নে সহায়ক, মামলা-মোকদ্দমার ভিত্তি সৃষ্টির সহায়ক, উৎপাদন বৃদ্ধির প্রণোদনা-বিরুদ্ধ, ভূমি-জল দস্যুবৃত্তির সহায়ক, ভূমি-জলা কেন্দ্রিক যত ধরণের দুর্নীতি ঘটানো সম্ভব তার সক্রিয় সহযোগী। আর এসব কারণেই মাঝখান দিয়ে লটেপুটে খাচ্ছে ভূমি-জলা সন্ত্রাসীরা; ভূমি-জলা সংক্রান্ত দুর্নীতি ডালপালা গজিয়ে বিস্তৃতি লাভ করছে; সৃষ্টি হচ্ছে ভূমি-জলা জোচ্চোর-দালাল গোষ্ঠী– এসবই ইতোমধ্যে দুর্বৃত্তায়িত অর্থনীতি ও রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন অধিকহারে পুনরুৎপাদনে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

এ দেশে ভূমি আইনের বিবর্তন বিশ্লেষণে মানুষ-বিরোধী তিনটি বিষয় লক্ষণীয়:

(১) সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন জটিল ও দুর্বোধ্য– মানুষের কল্যাণে আইন প্রণয়ন হয়নি;
(২) উপনিবেশের স্বার্থ রক্ষার আইন-কানুন এখনও বহাল আছে; এবং
(৩) একই বিষয়ে পরস্পর বিরোধী আইন-কানুন পাওয়া যায় যা ধনী-স্বার্থ সহায়ক।

ভূমি সংক্রান্ত সবচে জনকল্যাণকামী আইনটি হলো "পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ত্ব আইন" (১৯৫১), যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে "রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে কোন অন্তবর্তী সত্ত্বা থাকবে না"– যে আইন গত অর্ধ শতকেও বাস্তবায়ন হয়নি। সেইসাথে জমির মালিকানা সিলিং পাল্টানো হয়েছে কয়েক দফা; সিলিং উদ্বৃত্ত খাস জমি সবসময়েই প্রাক্কলিত হিসেবের তুলনায় পাওয়া গেছে কম এবং যাও পাওয়া গেছে

তা স্বল্প-মাত্রায় উর্বর; সিলিং উদ্বৃত্ত জমি দেবার ক্ষেত্রে আইন করে পরিবারের সংজ্ঞা পাল্টানো হয়েছে বহুবার; জমি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির আইন-কানুন যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ, স্থানীয়ভাবে সমাধানের আইন কার্যকরী নয়, উচ্চ-আদালতে নিষ্পত্তির প্রয়োগ-কৌশল ধনীদের স্বার্থ রক্ষা করে; খাস জমিতে ভূমিহীনদের সমবায় সৃষ্টিতে আইন থাকলেও কখনো তা বাস্তবায়িত হয়নি; সরকারী নীতিমালায় নাগরিক সমাজসহ কৃষক সংগঠন, বিভিন্ন পেশাজীবিদের সংগঠন ও জনকল্যাণকামী বেসরকারী সংস্থাসমূহের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা স্বীকৃত নয়।

খাস জমি-জলা বিতরণমূলক কৃষি-ভূমি সংস্কার সম্ভব

আমাদের অনেকেই খাস জমি-জলা সংক্রান্ত বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে না বুঝে অথবা আংশিক বুঝে– বিতরণমূলক ভূমি সংস্কারের অসম্ভাব্যতার কথা বলেন। নাকচ করে দেন সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবনা। আসলে দেশে এ পর্যন্ত যে পরিমাণ খাস জমি চিহ্নিত করা গেছে তা দিয়েই প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকে ০.৩৭ একর খাস কৃষি জমি এবং ০.৩৮ একর খাস জলাভূমি বন্টন করা সম্ভব। আর সব ধরনের খাস জমি মিলিয়ে প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১.৫২ একর বন্টন করা সম্ভব।

জেলা ভিত্তিক বিবেচনায়, গড়ে প্রতিটি জেলার ভূমিহীন পরিবারে ১.১৪ একর খাস জমি (খাস জলাভূমি বাদে) বন্টন করা সম্ভব। আর ৬৪টি জেলার কমপক্ষে ১৪টি জেলায় ভূমিহীন পরিবার প্রতি গড়ে ১.৫ একরেরও বেশি জমি বন্টন সম্ভব। আর এ পরিমাণ কৃষি জমি তো এদেশের ক্ষেত্রে শ্রম-ঘন উচ্চ-উৎপাদনশীল জোত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

শহরের খাস জমির বাজার মূল্য গড়ে গ্রামীণ খাসজমির তুলনায় ১০০ গুণ বেশী; আর ঢাকা-চট্রগ্রাম-খুলনার মেট্রোপলিটন এলাকার সাথে তুলনা করলে তা হবে কয়েক হাজার গুণ। শহুরে খাস জমি এখন পুরোটাই আর্থ-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়িত গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এ দখলি স্বত্ব বজায় রাখতে এবং দখল বাড়াতে দুর্বৃত্তরা রীতিমত সশস্ত্র মাস্তান পুষছে, যে মাস্তানী এখন আর শুধু জমি-কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে সীমিত নয়। ঢাকা শহরের ৩০০০-এর উপরে বস্তির নাম এখন ব্যক্তির নামে; ঢাকার ভিতরে আর চারপাশে কয়েক লাখ একর নীচু-খাস জমি এখন বেআইনি ভরাট চলছে। এসব খাস জলা-জমি দরিদ্র মানুষের ন্যায্য প্রাপ্য। ভুমি-কৃষি-জলা সংস্কারে এ বিষয় এড়িয়ে গেলে অন্যায় হবে।

দেশে বর্তমানে যে পরিমাণ খাস জমি-জলা রয়েছে তা দিয়েই একটি বন্টনযোগ্য "ভূমি সংস্কার" সম্ভব। আর অতীতে যেহেতু কোন সরকারের আমলেই ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে সত্যিকার আন্তরিক ও উদ্যোগী প্রয়াস নেয়া হয়নি, তাই যারা ভূমি সংস্কারের সম্ভাব্য অভিঘাত নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন–আমাদের বিবেচনায় হয় তারা না জেনে-শুনে করছেন, না হয় নিছক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করছেন। ভয়-ভীতি অথবা অন্য কোন কারণ থাকলে কৃষি-ভূমি সংস্কারের পক্ষে কথা না বলা অন্যায় হবে না, তবে বিরুদ্ধ যুক্তি প্রদর্শন হবে রীতিমত দণ্ডযোগ্য অপরাধ।

ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার : কিছু সুপারিশ

এদেশে জনকল্যাণকামী ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার-এর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদির গবেষণা-ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ উপস্থাপনে চেষ্টা করেছি। বিষয়টি দুর্বৃত্তবেষ্টিত কাঠামোতে

আমাদের দেশে সবচে অমীমাংসিত বিষয়। বিষয়টি জটিল ও পরস্পর সম্পর্কিত। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে জনকল্যাণকামী ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে দেশের সকলের বিবেচনার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমূলক প্রস্তাব উত্থাপন করতে চাই। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে প্রস্তাবিত সুপারিশ আপনা-আপনি বাস্তবায়িত হবে এমনটি আমি মনে করি না। জমি-জলা বিষয়ের অন্তর্নিহিত স্বার্থ-সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আমরা প্রায় সবাই অবগত। সে কারণেই বিশ্বাস করি যে বিষয়টির সুরাহা সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক স্বীকৃতি, সদিচ্ছা, অঙ্গীকার, যোগ্যতা এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংগঠিত কর্মকান্ডের উপরেই নির্ভর করছে। আমার প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ আমি পাঁচটি বৃহৎ বর্গে বিভক্ত করেছি (অবশ্যই এসবই পরস্পর সম্পর্কিত):

(ক) খাস জমি ও জলা সংক্রান্ত,
(খ) অর্পিত সম্পত্তি সম্পর্কিত,
(গ) ক্ষুদ্র জাতি সত্বার মানুষদের জমি-জলা-বনভূমি সম্পর্কিত,
(ঘ) ভূমি মামলা সংক্রান্ত, এবং
(ঙ) অন্যান্য আইন-কানুন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও নীতিমালা সংক্রান্ত।

খাস জমি-জলা সংক্রান্ড় সুপারিশ

১. সমস্ত খাস জমি (কৃষি, অকৃষি ও জলাভূমি) অবিলম্বে চিহ্নিত করা।
২. খাস জমি চিহ্নিতকরণের সমস্যা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি প্রচার মাধ্যমসমূহে (রেডিও, টিভি ও বাংলা দৈনিকসহ) প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।
৩. খাস জমির বিভ্রান্তিকর শ্রেণীবিভাজন বন্ধ করা (যেমন কৃষি জমিকে জলাভূমি হিসেবে দেখানো)।
৪. বন্টনকৃত ও বন্টনযোগ্য সমস্ত খাস জমি অবৈধ দখলদারদের কাছ থেকে যত দ্রুত সম্ভব উদ্ধার করা।
৫. খাস জমি চিহ্নিতকরণ কমিটিতে কৃষক সংগঠন, ক্ষেত মজুর, রাজনৈতিক দলসমূহ, বেসরকারী সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসমূহ ও স্কূল-শিক্ষকদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।
৬. এসব কমিটিতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের প্রভাব হ্রাস ও সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া।
৭. কৃষক ও ভুমিহীনদের প্রতিনিধিদের সর্বাধিক উপস্থিতির ভিত্তিতে জাতীয় পর্যায়ে একটি খাস জমি ব্যবস্থাপনা কমিটি ও জেলা পর্যায়ে একটি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্টন কমিটি তৈরী করা। খাস জমি উদ্ভূত যে কোন ধরনের বিবাদ অনুসন্ধান/তদন্ত করা এবং মালিকানা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা এই কমিটিকে প্রদান করা।
৮. খাস জমির চিহ্নিতকরণ, বাছাইকরণ, বন্টন এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে গরীব জনসাধারণ ও তাদের সবধরনের প্রতিষ্ঠান/সংগঠনসমূহের সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৯. খাস জমি বন্টনের ক্ষেত্রে সহজবোধ্য বাংলায় লিখিত ফরম গরীব জনগণের মাঝে বিতরণ করা ।
১০. ভূমিহীন জনগণ যেন তাদের মাঝে বন্টনকৃত সম্পত্তি রক্ষা করতে পারে তার জন্য পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।
১১. জমির দখলী স্বত্বের সমস্যা ও ফসলের উপর কর্তৃত্বের সমস্যা নিরসনে আইনগত সহায়তা ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা। এসব ব্যাপারে এনজিও ও অন্যান্য পেশাভিত্তিক সংস্থার সহায়তা

(যেমন আইনগত পরামর্শ) ব্যবস্থা জোরদার করা।

১২. উৎপাদনমুখী উপকরণ ও কৃষিজ-ইনপুট কেনার ক্ষেত্রে ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে ঋণ সুবিধার প্রসার ঘটানো। উৎপন্ন ফসলের বাজারজাতকরণের সহায়ক ব্যবস্থা চালু করা।

১৩. সরকারের পক্ষ থেকে গরীব ভূমিহীন জনগণকে পণ্যের ন্যায্য মূল্য সহায়তা প্রদান করা।

১৪. চিহ্নিত (৮ লক্ষ ৩ হাজার ৩০৮ একর) খাস জমি গরীব ও ভূমিহীন জনসাধারণের মাঝে অবিলম্বে বন্টন করা।

১৫. কৃষি খাস জমি বন্টন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি জাতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রকাশ ও প্রচার করা এবং তা তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়া।

১৬. সম্ভাব্য সব ধরনের পরিস্থিতিতে সমবায়ভিত্তিক খামার ব্যবস্থা গঠন করা।

১৭. প্রাপ্য সমস্ত অকৃষি খাস জমি শহুরে গরীব জনগণ ও বন এলাকার জনগণের মধ্যে বন্টন করা।

১৮. জেলে সম্প্রদায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বৃত্তিধারী সম্প্রদায়ের মধ্যে খাস জলাভূমিসমূহ বন্টন করা।

১৯. ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জবরদখলকারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এবং সাথে সাথে স্থানীয় তহসিল অফিস, অঈ-খধহফ, ঞঘঙ, থানা এবং সর্বোপরি কোর্ট থেকে ন্যায়সম্মত অধিকার আদায় করে নেবার জন্য কৃষকদের সংগঠিত শক্তি গড়ে তোলা।

২০. কৃষক আন্দোলন/গরীব মানুষের অধিকার আন্দোলনের সাথে যুক্ত নাগরিক সমাজ-সংগঠনগুলোর ধফাড়পপু কার্যক্রম জোরদার করা।

২১. কৃষক আন্দোলনের সফল কাহিনীসমূহ সঠিকভাবে নথিভুক্ত, প্রকাশ ও ব্যাপকভাবে প্রচার করা।

২২. ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডে নিবিড় তদারকির ব্যবস্থা করা।

২৩. বন্টন পরবর্তী অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য একটি Watch dog mechanism (যেমন নাগরিক কমিটি) প্রতিষ্ঠা করা।

২৪. বন্টন প্রক্রিয়ার গতি দ্রুততর করার জন্য সংশ্লিষ্ট ভূমি আইনের পরিবর্তন/পরিমার্জন/মান উন্নয়ন করা।

২৫. খাস জমির বন্টন প্রক্রিয়াকালীন সময়ে ভূমি অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২৬. খাস জমি ও ভূমিহীন ব্যক্তিদের সনাক্তকরণের জন্য সরকারী জরিপের পাশাপাশি ভূমিহীন কৃষক, কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক দলসমূহ ও NGO-সমূহের প্রতিনিধি সমবায়ে একটি স্বাধীন কমিটি গঠন করা।

২৭. ভূমিহীন জনগণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা।

২৮. প্রভাবশালীদের দ্বারা অন্যের জমি আত্মসাৎ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্থানীয় ভূমিহীন ও সচেতন নাগরিকবৃন্দের সমন্বয়ে একটি চাপ সৃষ্টিকারী জোট (pressure group) গঠন করা।

২৯. ভূমি-সংশ্লিষ্ট আইন-কানুন সহজবোধ্যভাবে জনগণের মধ্যে প্রচার করা।

৩০. গরীর জনগণের আবাসন সমস্যা দূরীকরণে খাস জমি ব্যবহার করা।

৩১. প্রভাবশালীদের দ্বারা দায়েরকৃত ভূমিহীনদের বিরুদ্ধে যত ধরনের মামলা আছে তা প্রত্যাহার করা।

খাস জমি নিয়ে অতীতে বাগাড়ম্বর হয়েছে অনেক। কাজের কাজ হয়েছে যৎসামান্য। দেশের শতকরা ৬০ জনকে ভূমিহীন রেখে উন্নতি অসম্ভব। দেশে প্রকৃত মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে তথা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় "excluded"-দের "include" করতে হলে একটি মৌলিক কৃষি সংস্কার (ভূমি ও জলা

সংস্কার যার অনুষঙ্গ) অনস্বীকার্য। আর তা বাস্তবায়ন করতে হলে ক্ষমতায় যে সরকারই থাকুক না কেন থাকতে হবে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, হতে হবে তাকে দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, উদ্যোগী ও আন্তরিক। আমাদের চিহ্নিত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ (enabling environment) নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত পূর্বশর্তসমূহ পালন করতে হবে :

১. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে খাস জমি-জলা আত্মসাৎ করে নিজেদের ভাগ্য বানানোর জন্য দেশে একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে, যারা খাস জমির সুষম বন্টনে প্রধান অন্তরায়।
২. সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে যে অবৈধ দখলদারদের বড় অংশ সবসময়ই ক্ষমতাসীনদের সম-দলভুক্ত।
৩. ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড ব্যবস্থা সেকেলে; ভূমিসংশ্লিষ্ট অফিস-আদালত অদক্ষ ও চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। রেকর্ড ব্যবস্থায় গ্রহণযোগ্য মাত্রার স্বচ্ছতা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।
৪. সরকার ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহকে অনুধাবন করতে হবে যে গ্রামীণ দারিদ্র্য নিম্নতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা সম্ভব যদি প্রকৃত ভূমিহীন কৃষকদের মাঝে খাস জমি বন্টন করা যায়।
৫. খাস জমির চিহ্নিতকরণ, বন্টন এবং কৃষকের কার্যকর অধিকার নিশ্চিতকরণ – এসব ইস্যুতে জাতিয় সংসদে বিশেষ অধিবেশন আহবান করা উচিত।
৬. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারপত্রে খাস জমি-জলা সংক্রান্ত সমস্ত ইস্যুতে স্পষ্ট ঘোষণা থাকা প্রয়োজন।
৭. গরীব জনগণের অধিকারের প্রশ্নে সমস্ত কৃষক সংগঠনগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও খাস জমির বন্টনের ক্ষেত্রে সরকারের অদক্ষতার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা।
৮. খাস জমি বিতরণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে স্থানীয় এবং থানা পর্যায়ের সমস্ত সামাজিক সংগঠন, NGO ও রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র-যুব সংগঠনসমূহের কণ্ঠ প্রসারিত করা।

অর্পিত সম্পত্তি আইন ও আইনে ক্ষতিগ্রস্ত সম্পর্কিত সুপারিশ

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন ও সংশ্লিষ্ট ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি যেহেতু অত্যন্ত জটিল সে জন্যই সমাধান নিমিত্তে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কিছু পূর্বশর্তের কথাও উল্লেখ করেছি। সমাধানযোগ্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বেদখলকারী গোষ্ঠি ও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্টরা ইতোমধ্যে পরিকল্পিতভাবেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা প্রকাশ্যে প্রচার করছেন। শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনের আওতাধীন সম্পদ-সম্পত্তির মালিক সরকার নয়, সরকার হ'ল রক্ষক/জিম্মাদার (custodian not owner)। সরকারের আইনগত বাধ্যবাধকতা হ'ল ঐ সম্পত্তি মূল মালিক এবং/অথবা তার উত্তরাধিকারীদের বুঝিয়ে দেয়া; সেই সাথে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বন্দোবস্ত (লিজ) দেয়া এবং বন্দোবস্ত প্রদানের ক্ষেত্রে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারদের অগ্রাধীকার দেয়া। সরকার যখন নিজেই বলছেন যে ১ - ১.৫ লাখ একরের বেশী তার হাতে নেই, তখন ধরে নিলে হিসেবে কোন ভুল হবে না যে ২০ লাখ একর দুর্বৃত্তরা গ্রাস করেছে।

আমি স্পষ্ট মনে করি যে সমাধান হতে হবে সুনির্দিষ্ট (specific) ও বাস্তবসম্মত (realistic)। যেহেতু

সমস্যাটি ভূমি সম্পদকেন্দ্রিক ও তা ঐতিহাসিক রূপ পরিগ্রহ করেছে সেহেতু সুপারিশকৃত কোন কোন সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞজনের অভিমত/মতামত নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমার প্রধান সুপারিশগুলো হ'ল নিম্নরূপ:

১. অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যার্পণ আইন (the Vested Property Repeal Act-2002)- আর কালক্ষেপণ না করে বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে প্রত্যার্পন আইনে বিশেষজ্ঞরা ইতোমধ্যে যে সব পরিবর্তন সুপারিশ করেছেন সে সব বিবেচনা করা।

২. জাতীয় সম্প্রচার মাধ্যমে সরকারী ঘোষণা হিসেবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া যে উক্ত আইনে হিন্দু সম্পত্তি তালিকাভুক্তকরণ আইনত দন্ডনীয় অপরাধ।

৩. শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে সম্পদ প্রত্যার্পণের লক্ষ্যে মূল মালিক ও তার উত্তরাধিকারীদের বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা (জমি ও অন্যান্য সম্পত্তির বিবরণসহ)।

৪. সমস্যার প্রকৃত সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সরকারী রক্ষণাবেক্ষণাধীন সম্পত্তি মূল মালিক/ উত্তরাধিকারীদের কাছে লীজ্ (বন্দোবস্ত) দেয়া।

৫. শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে অধিগৃহিত যা কিছু ৯৯ বছরের লীজ্ (বন্দোবস্ত) দেয়া হয়েছে সেগুলো বাতিল করে মূল মালিক/উত্তরাধিকারীদের ফিরিয়ে দেয়া।

৬. সম্পত্তি প্রত্যার্পণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার (priority) দেয়া, যেমন

   ক) অর্পিতকরণ প্রক্রিয়ায় যারা ভূমিহীন ও নিঃস্ব হয়েছেন
   খ) যে সব পরিবারের প্রধান হলেন মহিলা
   গ) অর্পিতকরণের ফলে যারা বসতভিটা হারিয়েছেন
   ঘ) অর্পিত মন্দির , প্রার্থনাস্থল, শ্মশান ঘাট ইত্যাদি
   ঙ) তহসিলদারসহ ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা যে সব সম্পত্তি দখল করেছেন
   চ) যে সকল ক্ষেত্রে প্রায় সকল উত্তরাধিকারী এ দেশের নাগরিক
   ছ) ১৯৬৫-৭১ পর্যন্ত যাদের সম্পত্তি শত্রু-সম্পত্তি হয়েছে এবং যারা/যাদের আইনী উত্তরাধীকার এদেশের নাগরিক।

৭. জবরদখলকৃত সম্পত্তি (যা সরকারীভাবে বন্দোবস্তকৃত নয়) চিহ্নিত করে বিস্তারিত তালিকা প্রণয়ন করা।

৮. যে সকল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সম্পত্তি প্রত্যার্পণ বিভিন্নকারণে বিলম্বিত হতে পারে অথবা সমাধান বিঘ্নিত হতে পারে তাদের জন্য বিশেষ 'ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ' এর ব্যবস্থা করা। ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে সরকারী খাস জমি-জলা, বন্ড, ঋণ সুবিধা (অর্থে এবং/ অথবা পণ্যে) ইত্যাদি।

৯. যে সকল শত্রু/অর্পিত সম্পত্তির আইনগত দাবিদার (উত্তরাধিকারী) অনুপস্থিত সে সকল সম্পত্তি মানব উন্নয়ন কর্মকান্ডে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে ও ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র হিন্দুজনগোষ্ঠির (বিশষত: নিম্ন বর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের) উন্নয়নে ব্যবহার করা।

১০. আইন বাতিল করে সমস্যার সমাধানকাজ শুরু করা যেতে পারে সে সকল অঞ্চলে যেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তির (রাজনৈতিক ও বেসরকারী সংস্থা) গণভিত্তি অপেক্ষাকৃত সুদৃঢ়।

শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইনে ১০ লাখ হিন্দু পরিবার ২১ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি হারিয়েছেন। অমানবিক এই সমস্যাটি গত ৪০ বছর যাবত জিইয়ে রাখা হয়েছে; ভূ-সম্পত্তি হাত বদল হয়েছে যে কারণে

অনেক ক্ষেত্রেই আইনগতভাবে প্রকৃত মালিকানা প্রতিষ্ঠা করাও হয়ত বা দুষ্কর; সরকার বলছেন তাদের হাতে মাত্র ১-১.৫ লাখ একর ভূ-সম্পত্তি আছে অর্থাৎ প্রায় সকল সম্পত্তি সরকারের বেহাত হয়েছে; জোরদখলকারীরা সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত ও ক্ষমতা বলয়ের সাথে সুসম্পর্কিত - সুতরাং কেউ কেউ হয়তো বা ভাবতে পারেন যে সমস্যার সমাধানে উত্থাপিত সুপারিশসমূহ কল্পনাপ্রসূত অথবা যথেষ্ট বাস্তবমুখী নয়। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট - সমস্যাটি মানব-সৃষ্ট কিন্তু মনুষ্য বিরোধী। সুতরাং সভ্য সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য সমাধান হতেই হবে, নচেৎ ভবিষ্যতে একই ধরণের এবং অপেক্ষাকৃত বড় মাপের ঐতিহাসিক বিপর্যয় অনিবার্য।

ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের জমি-জলা-বনভূমি সংক্রান্ড় সুপারিশ

১. বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্রজাতিসত্ত্বার* মানুষের মধ্যে যে *শান্ড়ি চুক্তি* স্বাক্ষরিত হয়েছে (ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে) তা পূর্ণভাবে (কোনভাবেই খন্ডিত নয়) এবং দ্রুত বাস্ত বায়ন করা।

২. শান্তি চুক্তির যে সকল ধারার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এখনও কার্যকরী হয়নি সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া, যেমন *ভূমি কমিশন* সক্রিয় করা।

৩. জোরপূর্বক দখলকৃত পাহাড়ী জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি-শান্তি চুক্তিতে বর্ণিত প্রক্রিয়া মোতাবেক– ভূমি কমিশনে প্রেরণ ও সমাধান করা।

৪. সমতল ভূমির যে সকল বাঙালী পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপন করেছেন– তাদের স্বেচ্ছায় সমতল ভূমিতে ফিরে আসার জন্য প্রণোদনা দেয়া।

৫. সমতল ভূমির বাঙালী বসতি স্থাপনকারী অথবা বসতি নন, বন বিভাগ, সেনা বিভাগসহ সরকারের যে এজেন্সি (উন্নয়ন প্রকল্পসহ) কর্তৃক ব্যক্তিগত অথবা যৌথ ভুমি-বন অধিগ্রহণ এখন থেকে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা (complete moratorium)।

৬. ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের ভূমি-অধিকার (যা আংশিভাবে CHT Regulation ১৯০০- এ স্বীকৃত) প্রাতিষ্ঠানীকিকরণে সরকারের পক্ষ থেকে আইনগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া।

৭. ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত শান্তি চুক্তির সাথে ভূমি কমিশন আইন ২০০১-এর যে সব ধারা সাযুজ্যহীন সেগুলো সংশোধন করা (শান্তি চুক্তি অনুযায়ী)।

৮. পার্বত্য এলাকার বাসিন্দা নন অথচ রাবার চাষসহ অন্যান্য প্লানটেশন চাষের জমি নিয়েছেন এবং গত ১০ বছর চাষাবাদ করছেন না এমন সব চুক্তি বাতিল করা।

ভূমি মামলায় পারিবারিক ও জাতীয় অপচয় রোধ সংক্রান্ড় সুপরিশ

সামগ্রিক দূর্বৃত্তায়িত আর্থ-রাজনৈতিক কাঠামো বহাল রেখে যেমন সমস্যার আদর্শ সমাধান সম্ভব নয় তেমনি এটাও ঠিক যে কাঠামো পরিবর্তন না করেও কিছু দূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব। এদেশে ভূমি-মামলার বিষয়টির সুরাহা দেখতে হবে সামগ্রিক ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার (land-agrarian-aquarian reform) সহ শিল্পায়ন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রকৃত মানব উন্নয়ন-এর অংশ হিসেবে। আর এসব বৈপ্লবিক এবং/অথবা বড় মাপের সংস্কারমুখী কর্মকান্ড সংগঠিত না করা গেলেও কিছু কিছু

* আদিবাসী না'কি উপজাতি না'কি পাহাড়ি জনগোষ্ঠী বলা সঙ্গত এবিষয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হতে পারে।

সংস্কার করা সম্ভব যা ভূমি মামলা-সংশ্লিষ্ট দুঃখ-দুর্দশা-কষ্ট-ক্লেশ প্রশমনে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে সংস্কারের আওতায় আসতে পারে: (ক) ভূমি আইন ও প্রশাসন; (খ) সম্পূর্ণ বিচার-আইন ব্যবস্থা; (গ) প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট খাত ও ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা। এবং অবশ্যই "জনগণই হইবেন প্রজাতন্ত্রের মালিক" (সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭.১)-বিষয়টি সংশ্লিষ্ট জনকল্যাণকামী রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের লাগাতারভাবে বলে যাওয়া এবং যেখানে যতটুকু সম্ভব কার্যকর করার প্রচেষ্ঠা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ফলপ্রদ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এসব বিবেচনা থেকেই আমার প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

১. সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে কোর্ট, ভূমি প্রশাসন, ও থানা-পুলিশের দুর্নীতি হ্রাসে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা।
২. স্থানীয় পর্যায়েই (গ্রাম/ইউনিয়ন/পাড়া/মহল্লা) ভূমি সংক্রান্ত বিবাদ মিমাংসার সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ বিষয়ে কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা।
৩. ভুমি মামলার দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা– তবে তা হতে হবে সম্পূর্ণ আইনসম্মত (কারণ দ্রুত নিস্পত্তি আর্থিক-পেশী প্রতিপত্তিবানদের জন্য লাভজনক হতে পারে)। ভূমি মামলা শ্রেণীবদ্ধ করে বিভিন্ন শ্রেণীর মামলার নিস্পত্তির সময়-সীমা বেঁধে দেয়া।
৪. উন্নত মানস-কাঠামো সম্পন্ন অধিক সংখ্যক দক্ষ পেশাজীবি বিচারক নিয়োগ দেয়া।
৫. ন্যায় বিচারের রায় কার্যকরী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা (এক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা স্বচ্ছ করা)।
৬. ভূমি মামলা কোর্টে আসার পরে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিক সমাজের মতামত জানা।
৭. উপজেলা কোর্ট পুনঃস্থাপন করা (জনকল্যাণকামী প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ)।
৮. ভূমির প্রকৃত মালিক অথবা তার প্রকৃত উত্তরাধিকার নিরূপণ করা (বিক্রেতার মালিকানা নিশ্চিত না হয়ে রেজিস্ট্রেশন না করা; জাল দলিল নিরূপণ করার ব্যবস্থা করা)।
৯. রেজিস্ট্রশনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সার্টিফিকেশন-এর ব্যবস্থা করা।
১০. মাঠ পর্যায়ের তদন্ত ছাড়া *মিউটেশন* (নামজারি অথবা জমা-খারিজ) না করা।
১১. ভূমি রেকর্ড সিস্টেমে কোর্টকে সম্পৃক্ত করা।
১২. ভূমি মামলার রায় প্রভাবিত করতে রাজনীতিক বা স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরত রাখা– বিষয়টি শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা (সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করা)।
১৩. যারা জমির জাল দলিল/কাগজপত্র করা এবং অবৈধ জমি দখলের সাথে সম্পৃক্ত তাদের জন্য কঠোর শাস্তির আইন প্রণয়ন করা এবং তা বাস্তবায়ন করা (এ ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজের ভূমিকা বিধিবদ্ধ করা)।
১৪. এমন আইন করা যাতে জমি-জমার জাল দলিলকরণের সাথে সম্পৃক্তরা তাদের কৃতকর্মে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়।
১৫. সার্ভেয়াররা যেন ভূমির রেকর্ড এবং সেটেলমেন্ট-এর কাজ সঠিক এবং প্রভাবমুক্তভাবে করতে সক্ষম হন– সরকারকে এ দায়িত্ব নেয়া।
১৬. উকিল ও সংশ্লিষ্টদের কর্মকাণ্ডের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও পেশার মানবিকীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা (প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; কেসের শ্রেণীভিত্তিক ফিস্ নির্ধারণ; ম্যাল-প্রাকটিস দূর করা ইত্যাদি)।
১৭. জমি-সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের মালিকানাস্বত্ব গুরুত্বসহ বিবেচনা করা ও তা বাস্তবায়ন করা।
১৮. পরিত্যাক্ত সম্পত্তি আইন এবং এ আইনে ক্ষতিগ্রস্তদের বিষয় খতিয়ে দেখা বিষয়টি জন্মসূত্রে

মানুষের সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিতকরণের সাথে সম্পর্কিত)।

আইন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা, নীতিমালা সংক্রান্ড় অন্যান্য সুপারিশ

১. খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্থ সংক্রান্ত নীতিবিরুদ্ধ অকৃষি খাস জমি বিক্রয়ের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।

২. সিকস্থি-পয়স্থির সকল চর-ভূমি খাস হিসেবে ঘোষণা দেয়া।

৩. দ্রুতভিত্তিতে সকল চরভূমির দিয়ারা সার্ভে করে তা দরিদ্র নারী-পুরুষের মধ্যে বন্দোবস্থ দেয়া।

৪. সকল ভূমি জরিপ কাজ অশিক্ষিত, অদক্ষ, অস্থায়ী জরিপকারীদের দিয়ে না করিয়ে প্রশিক্ষিত, দক্ষ ও স্থায়ী জনশক্তি দিয়ে করার ব্যবস্থা নেয়া।

৫. ভাগ/বর্গাচাষসহ অন্যান্য ভোগদখল স্বত্ব সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন (অপারেশন বর্গার আদলে) করে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

৬. কৃষি খাতে কর্মরত দিনমজুরসহ সকলের জন্য নারী-পুরুষভেদে সমান নিম্নতম মজুরী হার নির্দ্ধারণ করা এবং তা বাস্তবায়ন করা ।

৭. ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার আদিম পদ্ধতি বাতিল করে সম্পূর্ণ বিষয়টি সমন্বয়পূর্ণ একক কর্তৃত্বে আনার লক্ষ্যে ভূমি মালিকানার একক পদ্ধতির আওতায় সার্টিফিকেট (CLO: Unitary System of Certificate of Land Ownership) প্রদানের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা চালু করা (এ ক্ষেত্রে বাধার বিষয়াদি বিবেচনা করে জনগণকে অবহিত করা)।

৮. ভূমি ও জলার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সংশ্লিষ্ট দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য একটি "জাতীয় ভূমি-জলা ব্যবহার নীতি" (National Land-water Utilization Policy) প্রণয়ন করা।

৯. সরকারীভাবে ভূমি-জলা ব্যাংক (Land-Waterbodies Bank) প্রতিষ্ঠা করা। যে ব্যাংকে ভূমি-জলা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয়াদির হাল নাগাদ তথ্য কম্পিউটার সিস্টেমে রাখা যাবে এবং যখন যেভাবে প্রয়োজন যে কেউ তথ্য পেতে পারেন: খাস জমি ও জলার (চরের জমিসহ) ধরণ, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিতরণ-বন্দোবস্থ অবস্থা, বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা; সকল অর্পিত সম্পত্তির ধরণ, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বর্তমান মালিকানা অবস্থা, বন্দোবস্থ অন্যান্য; ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের জমি-জলা-বনভূমির পরিমাণ, বেদখলের পরিমাণ, স্থান, মৌজা, জবরদখলকারীর পরিচয়, বিবাদ-বিরোধ, নিষ্পত্তি-অবস্থা ইত্যাদি; চিংড়ি ঘেরের জমি-জলার পরিমাণ, স্থান, মৌজা, মালিকানা, জবর দখলের পরিমাণ (স্থানসহ), বিরোধ, ক্ষতির পরিমাণ ও প্রকৃতি, বিরোধ নিষ্পত্তির অবস্থা; সকল ভূমি মামলার ধরণ, পরিমাণ, স্থান, মৌজা, বিরোধ-এর কারণ, নিষ্পত্তির অবস্থা ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার: প্রয়োজন; সম্ভব কি?

জমি, জলা আর মানুষ (যাদের বেশিরভাগই গ্রামে বাস এবং দরিদ্র)– এসব বাদ দিলে বাংলাদেশে সম্পদ কোথায়? আর এ তিন সম্পদের কার্যকরী সম্মিলনই তো আসলে উন্নয়ন। যে মানুষ জমি ও জলায় শ্রম দেন তিনি তার মালিক নন– এটাই দুর্বৃত্তবেষ্টিত বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতা। জমি-জলা তো সম্পদের মাতা আর জমি-জলায় শ্রম দাতা হলেন সম্পদের পিতা। মাতা-পিতার প্রাকৃতিক

স্বাভাবিক এ সম্পর্কটি এ দেশে অস্বীকৃত। এখানেই তো অনুন্নয়নের গোড়ার কথা।

একথা তো ধ্রুব সত্য যে জমি ও কৃষকই হ'ল সভ্যতার ভিত যেখানে কর্ষণ হ'ল সভ্যতার সাংস্কৃতিক ভিত্তি। জমি – দুস্প্রাপ্য সম্পদ, আর সে কারণেই এ সম্পদের মালিকানা সবসময়ই পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক। আর জমির উপর ব্যক্তিমালিকানা সম্পৃক্ত বিষয়াদি সন্ত্রাস, কালো কর্মকাণ্ড, মামলা-মোকদ্দমাসহ প্রায় সকল ধরণের উৎপাদন বিরোধী ও মানব-কল্যাণ বিমুখ কর্মকাণ্ডের উৎস। আমাদের দেশে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির উৎসও জমি। সুতরাং বর্তমান কাঠামোতে কোন ধরণের জমি-জলা বন্টন (খাস-অখাস নির্বিশেষে) নিঃসন্দেহে প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। সেই সাথে একথাও অনস্বীকার্য যে, গরীব মানুষকে জমি দেবার কথা বলে ওয়াদা ভঙ্গ করেননি – এহেন সরকার এখনও পর্যন্ত বিরল। কিন্তু যেহেতু আইনগতভাবেই দরিদ্র জনগণই খাস জমি ও জলার প্রকৃত মালিক হবার কথা সেহেতু তাদের মালিকানা প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। দরিদ্র মানুষের মালিকানায় খাস জমি-জলা – দারিদ্র্য উচ্ছেদেও অন্যতম প্রধান কৌশল হতে পারে। এমনকি জাতীসংঘে গৃহীত ও আমাদের সরকার কর্তৃক স্বাক্ষরিত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল) অর্জনে অর্থনীতিতে বার্ষিক যে ৭%-৮% প্রবৃদ্ধির কথা বলা হচ্ছে ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার করলে শুধু যে তা অর্জন হবে তাই নয়, বরঞ্চ সেই সাথে ধনী-দরিদ্রের সম্পদ বৈষম্যও যথেষ্ট মাত্রায় হ্রাস পাবে। অর্জিত হবে প্রকৃত *সাসটেইনেবল ডেভেলপম্যান্ট* (টেকসই উন্নয়ন)।

জমি-জলা সম্পত্তির উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা-অধিকার অথবা আইনগতভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মালিকানা নিশ্চিত করার সাথে ধর্মের অথবা জাতিসত্ত্বা হিসেবে সংখ্যালঘু হবার অথবা দরিদ্র হবার কি সম্পর্ক? এ সম্পর্ক থাকতে পারে শুধু অসভ্য সমাজে। আমরা যতই অসভ্য সমাজে বাস করি না কেন– 'আমি (প্রত্যেকে) অসভ্য' এ দাবী তো ধোপ-দুরস্থ একজন দুর্বৃত্তও এদেশে মানবেন না। দেশকে সবার জন্য বাসযোগ্য করার আগে নিজের মানস-কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন; হতে হবে মনে প্রাণে মানবকল্যণকামী, অসাম্প্রদায়িক– এদেশে অধিকাংশ মানুষই তো মনে প্রাণে তাই। মনে রাখা উচিত হবে যে যেসব দুর্বৃত্তরা খাস জমি-জলা অথবা হিন্দুদের সম্পত্তি ও ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার সম্পত্তি জোরদখল করে লুটেপুটে খাচ্ছেন তারা কিন্তু এ দেশের গুটিকয়েক মানুষ– সংখ্যায় স্বল্প। ঐতিহাসিকভাবেই তো প্রগতির ক্ষেত্র ও অসাম্প্রদায়িক মানস-কাঠামো এদেশে যথেষ্ট উর্বর ও বিস্তৃত। তা হলে তো ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারও সম্ভব।

সমস্যাটা রাজনৈতিক। বৃহৎ রাজনৈতিক দল মাত্রই জমি-জলার বিষয়টিকে শুধু ভোটের ইস্যু হিসেবেই দেখেন। সেটাও তো ভাল কথা– অন্তত: ইস্যুটি স্বীকৃত (অনেক বড় মাপের ইস্যুও তো এখনও স্বীকৃত নয় আবার নন-ইস্যুকে ইস্যু করতেও আমরা পারদর্শী)। অবশ্য তারা ক্ষমতায় আসার আগে গরীব মানুষকে জমি-জলা সম্পত্তি দেয়ার কথা বলেছেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সম্পত্তি ফেরত দেবার কথা বলেছেন, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বার মানুষের সব সমস্যার সমাধানে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। আর অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের দল– প্রগতিশীল-অপ্রগতিশীল নির্বিশেষে একই ওয়াদা করেছেন– পার্থক্য হ'ল তারা কখনও রাষ্ট্রিয় ক্ষমতায় যেতে পারেননি; সেই সাথে এ নিয়ে কার্যকরী-ফলপ্রসূ কোন আন্দোলন-লড়াই সংগ্রাম করছেন– তাও নয়। নাগরিক সমাজসহ বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থার কেউ কেউ এ বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত কথা বলছেন। এখন যা দরকার সেটা হ'ল ভূমি-কৃষি-

জলা সংস্কারের বহুমুখী জটিল বিষয়টিকে জাতীয় ভবিষ্যত উন্নয়নের অন্যতম প্রধান চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কারের বিষয়টি যেহেতু এ দেশের মুক্তিকামী মানুষের যুক্তিসঙ্গত প্রাণ-দাবী সেহেতু ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন ভূমি সংস্কারের খসড়া প্রস্তাবও প্রণয়ন করেছিলো।*

কৃষি ও ভূমি সংস্কারের বিষয়টিকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে দেখতে হবে যেখানে মানব উন্নয়নে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে প্রগতিশীল রাজনৈতিক শক্তি, কৃষক সংগঠনসহ বিভিন্ন স্তরের নাগরিক সমাজকে পূর্ণমাত্রায় সম্পৃক্ত করতে হবে। সমস্যার সমাধানে প্রচলিত সরকার ব্যবস্থা ও ভূমি অফিসের চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করতে হবে Substantive Public Actions এর উপর। প্রস্তাবিত ভূমি-কৃষি-জলা সংস্কার সম্ভব। এ সম্ভাবনা বাস্তবে রূপ দিতে দুটি বিষয়ের সম্মিলন প্রয়োজন: (১) উষ্ণ হৃদয় অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানবকল্যাণকামী সাহসী নেতৃত্ব (insightful leadership with cool head, courage and warm heart aiming at human welfare), এবং (২) সমগ্র প্রক্রিয়ায়

* এ খসড়া প্রস্তাবের সারাংশ নিম্নরূপ: "১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিক থেকে এদেশের ভূখন্ডে জমি মালিকানায় মেরুকরণ শুরু হয়-বড়ো ও ছোট মালিক-চাষী দুই শ্রেণীই বাড়তে থাকে এবং মাঝারি চাষী কমতে থাকে, যার ফলে জমির মালিকানায় বৈষম্য বাড়তে থাকে। একই সঙ্গে ছোট মালিক-চাষী ও বর্গাচাষী দু'য়েরই আপেক্ষিক সংখ্যা বাড়তে থাকে। ছোট চাষীদের জমিতে নিবিড় চাষ ও আধুনিক চাষ-পদ্ধতির প্রয়োগের কারনে ফলনও বড়ো চাষীদের জমির তুলনায় বেশি হারে বাড়তে থাকে। তাই একই সঙ্গে দু'টো কারণে রাষ্ট্রীয় দর্শন অনুযায়ী সমতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের পথে যাবার জন্য, এবং দেশের কৃষিতে সার্বিকভাবে উৎপাদনের হার বাড়াবার জন্য ভূমি সংস্কার জরুরি হয়ে পড়ে। জমির বন্টনে পূর্ণ ইকুইটি এবং সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা কেবল সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় অথবা সামাজিক (যৌথ) মালিকানা ও যৌথ চাষের মাধ্যমেই হতে পারে যাতে ইকনমি অব্ স্কেল আদায় করা যায় এবং ফসলের বন্টন শ্রম অনুযায়ী হতে পারে। তবে ছোট ও মাঝারি মালিক-চাষীদের নিজের নিজের জমির ওপর গভীর টান থাকে যার ফলে হঠাৎ করে মালিকানা হারিয়ে ফেল্লে তারা উৎপাদন-কাজে নিরুৎসাহিত হয়ে পড়তে পারে এই কারণে এই পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বড়ো ভূস্বামীদের ক্ষেত্রে যারা জমিতে বড়ো স্কেলে শ্রমিক নিয়োগ করে ও পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় তাদের শ্রম শোষণ করে অনর্জিত আয় ভোগ করে তাদের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। এসব বিবেচনায় পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করে যে, ভূমি সংস্কারের প্রথম পর্যায়ে যে আয়তনে জমি ঐতিহাসিকভাবে বেশি ফলনশীল হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত মালিকানায় রেখে একটা সীমার ওপরে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত করা। এইভাবে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাবে সেখানে দৃষ্টান্তমূলক সমবায়ভিত্তিক চাষ হবে। বর্তমানে যেসব বর্গাচাষী এ-সমস্ত জমিতে চাষ করছে তাদের এই সমবায়গুলিতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেওয়া হবে। যে সমস্ত বর্গাচাষী ভূমি-সংস্কারসীমার চাইতে ছোট জমিতে কাজ করছে তাদের যতদিন সমবায়ের পরিধি বাড়িয়ে সদস্য করা না হয়; ততদিন তাদের আইনগত ও অর্থনৈতিক অবস্থানের উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রস্তাব করা হয়। সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য, এবং যাতে সমবায়ভিত্তিক চাষের বাস্তব পরীক্ষার জন্য অর্থপূর্ণ আয়তনে জমি উদ্বৃত্ত পাওয়া যায়, এই বিবেচনায় জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা প্রস্তাব করা হয় ১০ 'স্ট্যান্ডার্ড' একর, যে সীমা বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চলে জমির ফলনশীলতার তারতম্য অনুযায়ী কমবেশি হবে (যথা, কুমিল্লার জন্য ৭.৫ একর এবং যশোহরের জন্য ১৩.৮ একর)। এভাবে জমি রাষ্ট্রায়ত্ত হলে তাদের সমবায়ভিত্তিক চাষের জন্য ভূমিহীন পরিবার থেকে কর্মী নেওয়া হবে এবং তাদের সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই কর্মীদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা হবে অষ্টম শ্রেণী, এবং তাদের পরিবারিক জমির পরিমাণ তিন একরের অনুর্ধ হতে হবে। এদের মধ্যে এই কাজে মুক্তিযোদ্ধা এবং/অথবা সেচ-গ্রুপের দায়িত্বে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চাষীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে" (মো: আনিসুর রহমান, "পথে যা পেয়েছি", ২০০৪: ৫১-৫২)।